শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ এবং বাস্তবতা

(পথিকৃৎ, এপ্রিল ২০১০ সংখ্যা থেকে নেওয়া)

"Glorious is the writer who can express a complex and valuable social idea with such a powerful artistic simplicity that he reaches the hearts of the millions. Glorious is also the writer who can reach the hearts of these millions with a comparatively simple elementary content"[১] কথাগুলি বলেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এ. লুনাচারস্কি। আমাদের দেশে শরৎচন্দ্র ছিলেন এই ধরনের সাহিত্যিক। সহজ কথাকে তিনি যেমন সহজ করে বলতে পারতেন তেমনি দুরূহ তত্ত্বকথা, জটিল দার্শনিক বিষয়বস্তু এবং জীবন দর্শনকে তিনি সাহিত্যের জারক রসে সিঞ্চিত করে, আকর্ষণীয় করে পাঠকের দরবারে তুলে ধরতে পেরেছেন। এই কারণেই অগণিত পাঠকের হৃদয় তিনি জয় করেছেন। আজও তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা বিস্মিত করে। ঘটনার সংঘাত ও চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের হৃদয়ের দরজায় সত্য-প্রয়োজনের আর্তিকে পৌঁছে দিতে পেরেছেন অনন্য-সাধারণ শিল্প-নিপুণতায়। পাঠককুল তার রস গ্রহণ করতো কখনও বুঝে, এমনকি কখনও না বুঝে। একটা আশ্চর্যের বিষয় হল, শরৎসাহিত্যে কোথাও বড় বড় তত্ত্বকথার চাকচিক্যে, ভাষার অলঙ্কারে অথবা পাণ্ডিত্যের উদ্ধত প্রকাশে সাহিত্যের রসধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। বড় তত্ত্বকথা বা জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক কথা শরৎসাহিত্যে নেই একথা সত্য নয়। কিন্তু তা ছিল রসসিঞ্চিত হয়ে, এক অদ্ভূত শিল্পশৈলীর আধারে। বাস্তবিক পক্ষে এই কারণেই তিনি অত্যন্ত বড় মাপের এক শিল্পী। মুগ্ধচিত্তে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন, "আমাদের ভাষায় তিনি (শরৎচন্দ্র) এক অভিনব শক্তি সঞ্চয় করেছেন... কথা সাহিত্যিকের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারও বাংলার পাঠক-পাঠিকার হৃদয় অধিকার পেয়েছেন করেছেন।" শুধু তাই নয়, কবি তাঁর নিজস্ব সীমাবদ্ধতার অকপট স্বীকৃতি দিয়ে এমনও পর্যন্ত বলেছেন, "আমার গল্প বিনা মূলধনে ফাঁকির কারবার। পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতায় শরতের তহবিল ভরা- সে তহবিল সে পুরোপুরি খাটাইতেও জানে।"[৩]

একথা সকলেই কম বেশী স্বীকার করেন যে, শরৎচন্দ্র জীবনকে দেখেছেন জীবন যোগ করার পথে- অন্তরকে চিনেছেন অন্তর মিশিয়ে। তাই জীবন্ত অভিজ্ঞতার আলোক-স্পর্শে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও হয়ে উঠেছে খাঁটি রক্ত মাংসের মানুষ, আমাদের ঘরের লোক এবং নিতান্তই আপনজন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল 'সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই'-এর দলের দিকে। কিন্তু তাই বলে তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে দর্শনের যুক্তিধারার দৈন্য ছিল না। চিন্তায়, দর্শনে তিনি ছিলেন এদেশের বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক গণতান্ত্রিক চেতনা, নারীমুক্তি, জাতীয় স্বাধীনতার ধারণা, ব্যক্তির অধিকার সহ প্রতিটি প্রশ্নেই তিনি আমাদের দেশের নবজাগরণের বলিষ্ঠ আপসহীন ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জীর্ণ-পুরাতনের পরিবর্তে নতুনের জয়গান গেয়েছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পতাকাটিকে সে যুগে তিনি তুলে ধরেছিলেন গভীর নিষ্ঠায়। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মীয় আচরণ-সর্বস্ব পুরাতন ঐতিহ্যবাদের প্রভাবে বন্ধ্যা সমাজমানসকে ভেঙেছেন ভাঙতে চেয়েছেন। তবে তা করেছেন প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠক সমাজের মধ্যে তাঁদের মনে বেদনা জাগিয়ে, পরিবর্তনের আকৃতি সৃষ্টি করে। শরৎসাহিত্য সে অর্থে ছিল যথার্থই ক্রিয়াশীল। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কেবল সুবিমল আনন্দদানই করে না- রসের মাধ্যমে চেতনার তন্ত্রীতে আঘাত করে পাঠকের চেতনসত্ত্বাকে ক্রিয়াশীল করে। তাই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। এই বিপ্লবীরা ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে নিহত শহীদের রক্তমাখা জাতীয় পতাকা অভিহিত করেন। অগণিত পাঠকের হৃদয় যিনি জয় করেছেন, কেবলমাত্র কতকগুলি বড় কথার সমাহার না ঘটিয়ে সনাতন ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে জনচিত্তকে যিনি অবমূল্যায়ন বা তাঁকে কলুষিত করবার প্রচেষ্টা প্রতিবাদের

নতুন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সন্ধান দিলেন, তাঁর এই অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, ‘‘অকর্মণ্য পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া মঙ্গলময় নতুনকে সৃষ্টি - ইহাই বিপ্লবের মূল কথা একমাত্র আদর্শ। ...এই জন্য শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লবযজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক... তিনি বিপ্লবী এবং এই কারণেই তিনি বিপ্লবের যুগ প্রবর্তক। তিনি সব্যসাচী নহেন- সব্যসাচীর রথসারথী।’’[৪]

এই ধরনের সাহিত্যিক, যাঁরা অগণিত মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছেন, সমাজসংগ্রামে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছেন সেই সাহিত্যিকদের প্রতি সত্যিকারের মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে সে সম্পর্কে এ. লুনাচারস্কি বলেছিলেন, ‘‘Marxist critic should highly value such a writer.’’ মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘‘সাহিত্যের দরকার তো এইখানেই তত্ত্ববিচারের মাধ্যমে যে সত্যোপলব্ধি ও উন্নত ভাবনা-ধারণা গুলো গড়ে উঠেছে, রসোত্তীর্ণ করে তাকে গল্পের মাধ্যমে নানা ডালপালায় খেলাবার জন্য এবং মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির মধ্যেও তার জায়গা করে দেওয়ার জন্য। যাঁরা তেমন শিক্ষার বুনিয়াদ এবং ক্ষমতা না থাকার জন্য যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে বড় কথাগুলো গ্রহণ করতে পারেন না, রসসৃষ্টির মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে তাঁদের মনেও সেটা খানিকটা গেঁথে দেওয়া। এই কাজটি করার জন্যই তো সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা।’’[৫ক]

ব্যতিক্রমী মন্তব্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক মূল্যায়ন অনৈতিক

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আমাদের দেশে তথাকথিত মার্কসবাদীদের একটা অংশ শরৎচন্দ্রকে সে মূল্য দেননি। তাঁরা এমনও বলছেন যে, শরৎচন্দ্র হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন, সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন, মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। বলাবাহুল্য তাঁদের মতানুসারী একটি অংশের সমালোচক এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করে থাকেন। বাস্তবে তাঁরা যে কোন কারণেই হোক, শরৎচন্দ্রকে বা শরৎচন্দ্রের নামকে কলুষিত করবার চেষ্টা করে চলেছেন। একদল তথাকথিত প্রগতিবাদী সাহিত্য সমালোচকও তাঁকে ‘রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু’ বলে অভিহিত করেন। অগণিত পাঠকের হৃদয় যিনি জয় করেছেন, কেবলমাত্র কতকগুলি বড় কথার সমাহার না ঘটিয়ে সনাতন ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে জনচিত্তকে যিনি নতুন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সন্ধান দিলেন, তাঁর এই অবমূল্যায়ন ব্য তাঁকে কলুষিত করবার প্রচেষ্টা প্রতিবাদের প্রয়োজন রাখে। এই সমস্ত সমালোচকদের মধ্যে কারুর কারুর যেমন কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে, আবার একথাও সত্য যে, বিশেষ একদল পরিকল্পিতভাবেই এই অবমূল্যায়নের প্রয়াসে লিপ্ত - সুযোগ পেলেই তাঁরা তা চালিয়ে যান। বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা কিছু ঘটনা, শরৎসাহিত্যে কিছু চরিত্র উপস্থাপনার কথাকে তুলে ধরেন। বিশেষ করে, তাঁর মুসলমান বিদ্বেষ কতখানি প্রবল ছিল তা প্রমাণ করার জন্য মূলতঃ তাঁর ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’ (১), ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’ (২) এবং ‘বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা’ এই ভাষণ বা রচনাগুলির উল্লেখ করেন এবং তারই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য-জীবন ও তাঁর ধ্যানধারণার সামগ্রিক কোন বিশ্লেষণ যেমন করেন না তেমনি এই রচনাগুলির পটভূমি, তদানীন্তন সমাজ পরিবেশ-পরিস্থিতিরও যুক্তিসম্মত বিচার বিশ্লেষণ করেন না। অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা একইভাবে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই বিচ্ছিন্ন কয়েকটি রচনা এবং প্রগতিবাদী নামধারীদের সমালোচনাকে ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, এভাবে একজন মানুষের শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কোনও রচনার ভিত্তিতেই কি তাঁর সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা-মূল্যবোধের মূল্যায়ন করা সম্ভব বা উচিত?

একথা তো আমরা সকলেই জানি যে, কোন একজন সাহিত্যিককে বিচার করতে গেলে তাঁর সাহিত্যসাধনার স্থান-কাল-পরিবেশের ভিত্তিতে তা করতে হবে। দেখতে হবে, সেই স্থান-কাল-পরিবেশের প্রেক্ষিতে তদানীন্তন সময়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারা কোনটা এবং সেই সাহিত্যিক তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে রসের মাধ্যমে কতখানি সেই প্রগতিশীল চিন্তাকে প্রতিফলিত করতে পেরেছেন। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে এও দেখতে হবে যে, একজন সাহিত্যিক তাঁর জীবনচর্চা ও সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে যে জীবনদর্শনকে প্রতিফলিত করেছেন তার মূল অভিমুখটি কোন দিকে। অর্থাৎ তাঁর জীবনদর্শনের প্রধান ধারা কোনটি।

একথা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারিনা যে, একজন মানুষের জীবন সেই সময়ের সমাজ পরিবেশের অসংখ্য জটিল দ্বন্দ্বের মধ্যে আবর্তিত হয়। এই দ্বন্দ্বের আবর্তে চড়াই-উৎরাই আছে, আছে ঝড়-তুফান, আছে ছোট ছোট তরঙ্গ। নিরবচ্ছিন্ন এই সংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তের ভূমিকার ভিত্তিতেই ব্যক্তির জীবনের গতিপথ নির্ধারিত হয়। তার মধ্যে মূল ধারা কোনটি, dominant character কোনটি তা দেখে, তার ভিত্তিতেই সেই মানুষটির সামগ্রিক জীবনদর্শনকে বুঝতে হয়, উপলব্ধি করতে হয়। একজন মহান মানুষের জীবনের মধ্যে প্রধান ধারায় মহত্তর জীবনবোধের উজ্জ্বলতর দিকনির্দেশ থাকলেও কোথাও কোন রকম ছোটখাটো সীমাবদ্ধতা থাকে না- এই ধরনের চিন্তা ভ্রান্ত। বিজ্ঞানসম্মত দ্বান্দ্বিক বিচারধারা প্রসঙ্গে লেনিন তাই একসময় বলেছিলেন, ‘‘There are no pure phenomena– nor there can be– neither in nature nor in society– that is what Marxist dialectic teaches us.’’[৫খ] ফলে ছোটখাটো কিছু সীমাবদ্ধতাকে অবলম্বন করে কোন মানুষকে বিচার করা বা তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়ন করা বিভ্রান্তিমূলক, নতুবা তার মধ্যে হীন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। তাই মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন রচনার দ্বারা কোন সাহিত্যিককে বিচার করা যায় না কেউ করলে তা সঙ্গত নয় এবং যথাযথ বা নৈতিকও নয়।

শরৎচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের প্রতিভূ

শরৎচন্দ্রের জন্ম এবং তাঁর সাহিত্যসাধনা সবই পরাধীন ভারতে। একদিকে মধ্যযুগের অন্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা এবং অপরদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের বেড়াজাল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তদানীন্তন যুগ-সত্য। আমরা জানি, রামমোহনের ধর্ম সংস্কারের পথ বেয়ে সেই নব আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ আমাদের দেশে; নবজাগরণের সূচনা। ধীরে ধীরে মানবতাবাদের চেতনা ও আদর্শ প্রোথিত হয়েছে সমাজ জীবনে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ধারাবাহিকতায় নবজাগরণের প্রভাতসূর্য স্বরূপ বিদ্যাসাগরের অভ্যুত্থান। যথার্থই এক অসাধারণ চরিত্র। জীবনের বলিষ্ঠতায়, সুনিপুণ কর্তব্যনিষ্ঠায়, চরিত্রে পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাকে তিনি উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠতার এই সুর যদিও এদেশে পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে রক্ষিত হয়নি। বেদনার বিষয় হলেও এসত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নবজাগৃতির গতি-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, ‘এদেশে এই মানবতাবাদী চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে এমন একটা সময়ে যখন বিশ্বে মানবতাবাদ তার যৌবনের কাল অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত। সে তখন হারিয়ে ফেলেছে তার তেজোময় ররূপ। আমাদের দেশের নবজাগরণের পুরো ক্ষেত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার মধ্যে দুটো সুস্পষ্ট ধারা দেখতে পাব। একটি ধারা-যা ধর্ম ও ঐতিহ্যবাদের সঙ্গে আপস করে চলেছে। এই ধারাটিই ছিল প্রবল। পাশাপাশি দেখা যাবে আর একটি ধারা- যা ধর্ম এবং ঐতিহ্যবাদের ক্ষেত্রে আপসহীন। এই ধারাটি বিশাল ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি নিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। যদিও এই ধারাটির মধ্যেই নিহিত ছিল তদানীন্তন সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সর্বাত্মক ক্রমবিকাশের পথ। এই ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন শরৎচন্দ্র।’

শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শনটি গড়ে উঠেছিল গরীব, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্নার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে। ধর্মীয় অন্ধতা, কুসংস্কার, ভেদাভেদ, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, বিদেশী শোষণ-শাসন কীভাবে ভারতের জনজীবনকে নৈতিক দিক তুলেছিল তা অনুভব করতে পেরেছিলেন শরৎচন্দ্র থেকে নিঃশেষিত করে জাতির জীবনকে পঙ্গু করে জীবনের জীবন্ত অভিজ্ঞতায়। শরৎচন্দ্রের মানসিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন মানসিকতার ভিত্তিতে। এই মানসিক পটভূমিকার জন্য তাঁর মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল বিপ্লবাত্মক রূপ। ইউরোপে পার্থিব মানবতাবাদ ধর্মের পাশ্চাত্য নবজাগরণের অর্থাৎ পার্থিব মানবতাবাদের বেড়া ভেঙ্গে চার্চের আধিপত্য থেকে মানুষকে মুক্ত করেছিল। ইউরোপে পার্থিব মানবতাবাদ হাজার হাজার বছরের অন্ধ কূপমণ্ডুকতা ও চিন্তার জড়ত্ব থেকে মনন জগতে এনেছিল মুক্তির বেগবতী আকাঙ্ক্ষা। জীবনের যাত্রাপথে এসেছিল নতুন মূল্যবোধের জোয়ার। এই মানবতাবাদ- যা ধর্ম ও ঐতিহ্যের সাথে আপসহীন-মূলতঃ তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছিল

শরৎচন্দ্রের জীবনে এবং শরৎসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে। আবার মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে নবজাগরণের এই ধারাটি সমাজজীবনে বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করতে পারেনি। মূল ধারাটি ছিল আপসমুখী। নবজাগরণের এই আপসমুখী ধারা- যা একদিকে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান চাইছে, আবার তারই পাশাপাশি একই সাথে ধর্ম, ঐতিহ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করছে- তারই ব্যাপ্তি ছিল বেশী। এমনকী সশস্ত্র বিপ্লবী ধারার গুপ্তসমিতিগুলির উপরও হিন্দুধর্মীয় সংস্কার ও রীতিনীতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। ফলে সামান্য হলেও তার কিছু কিছু প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে আপসহীন ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বড় বড় বিপ্লবীর জীবনেও তার আঁচ প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু তার দ্বারা কোন ভাবেই তাঁদের মধ্যে চরিত্রের আপসহীন বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের দর্শনের সামগ্রিক ভূমিকাকে লঘু করে দেখা যায় না।

শরৎচন্দ্রের জীবনদর্শন হল সেই পার্থিব মানবতাবাদ যা অতিপ্রাকৃত কিছুকে মানে না, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসও করে না এবং তা নিয়ে তর্কও করে না। সামন্ততন্ত্রে ধর্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস, ভগবৎ ভক্তির ঘেরাটোপে ব্যক্তির বিকাশ ছিল বন্দী হয়ে। এর বিরুদ্ধে যুক্তি ও বিজ্ঞানের জয়গান সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে ব্যক্তির মুক্তি আকাঙক্ষা স্ফুরিত হল পার্থিব মানবতাবাদের মধ্য দিয়ে। যখন এই চেতনার সূচনাপর্ব, তখন এর সামাজিক তাৎপর্য হিসাবে পাশ্চাত্য দেশের রাষ্ট্রনীতিতে স্বীকৃত হল যে, ধর্ম এবং ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন থাকবে ব্যক্তির নিজস্ব বিষয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মাচরণ থাকবে না। এরই আর একটা উন্নত স্তর হল অজ্ঞেয়বাদ। শরৎ সাহিত্যে পার্থিব মানবতাবাদের এই উন্নততর রূপ অজ্ঞেয়বাদই মূর্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও সরাসরি, আবার কোথাও বা চরিত্র সৃষ্টি এবং তার সংলাপের মধ্য দিয়ে সেই চিন্তা পরিস্ফুট হয়েছে। সংলাপের মধ্যে সমাজের প্রচলিত সংস্কারের কথা থাকলেও, তা থেকে যে অনুভূতি পাঠকের হয় তাতে সংস্কারবিরোধী মানসিকতাই মূলত ফুটে ওঠে। 'মহেশ' গল্পের শেষে হতভাগ্য গফুর হাঁটু মুড়ে 'আল্লাকেই' ডেকেছে। এটাই তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কিন্তু তার চোখের জল পাঠকের মনকে আল্লাহ-র কাছে নিয়ে যায় না, নিয়ে যায় জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এখানে নিহিত রয়েছে শরৎ সাহিত্যের শিল্পশৈলীর উৎকর্ষতা। এরকম বহু উদাহরণ আছে। ধর্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র এমন পর্যন্ত বলেছেন যে, ''সমস্ত ধর্মই মিথ্যা- আদিম যুগের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নেই।''[৬] এমন স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কথা ক'জন সাহিত্যিক বলতে পেরেছেন এদেশে? তাঁর সমগ্র চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ। মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা হিসাবে যা কিছু জীর্ণ, পুরাতন, প্রাচীন প্রাণখুলে তাকে ভাঙার গানই ছিল শরৎ-চিন্তার মূল ধারা। 'পথের দাবী'র সব্যসাচী বলছেন, ''প্রাণখুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন ধর্ম, সমাজ, সংস্কার-সমস্ত ভেঙেচুরে ধ্বংস হয়ে যাক- এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই।'' অথচ তথাকথিত প্রগতিবাদীদের অনেকের কাছেই এ সত্যটি ধরা পড়েনি। শরৎচন্দ্রের প্রগতিশীলতাকে উপলব্ধি না করায় প্রগতির প্রবাহকে তাই তারা নানান কথার ধূম্রজালে আবদ্ধই করেছেন।

ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের সংগ্রাম

ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে তিনি কীভাবে সংগ্রাম করেছেন এবং যুক্তি বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস যে তাঁর কতখানি সুদৃঢ় ছিল তা বোঝা যায় মতিবাবুর সাথে চন্দননগরে আলাপ সভায়। সেখানে মতিবাবুরা যখন ধর্মকে সংস্কার করার কথা বলেছেন তখন শরৎচন্দ্র তার স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন ''আমি বলি মেরামত নয় - ঐটিকেই বাদ দাও।... আবার তাকে মেরামত করে খাড়া করবার দরকার কী? ছ-সাতশ বছরের পুরানো জিনিসটা যদি আবার দাঁড় করাও, আবার সেটা হাজার বছর ধরে চলবে।'' এইসব সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মানসিকতা নিঃসংকোচে ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন, ''যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার করে আবার দাঁড় করানো উচিৎ নয়।'' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তদানীন্তন সময়ে বাংলাদেশ সহ সমগ্র ভারতে হিন্দু ধর্মের 'পুনরুত্থান' বিষয়ক তত্ত্ব জনপ্রিয় ছিল। শরৎচন্দ্র এসব তত্ত্ব মানেননি। তিনি অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি' নামক উপন্যাসের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। 'ঐ

পুরুত আর মন্দির আর ঐসব ঘ্যানোর ঘ্যানোর কেউ পড়ে না'- এই ছিল তাঁর মন্তব্য। নিয়তিবাদেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য হ'ল, 'অদৃষ্ট জিনিসটাই চিরদিন জীবনসংগ্রাম ও ধর্মের মাঝে অচ্ছেদ্য অফুরন্ত সেতুর শিকলের মতো জুড়ে আছে।' পার্থিব মানবতাবাদী হিসাবে তিনি কিরণময়ীর মুখ দিয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, ''যা বুদ্ধির বাইরে তা বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না।.... যে মুখে বলেচেন জানা যায় না, সেই মুখেই আবার এত কথা বলচেন, যেন এইমাত্র স্বচক্ষে দেখে এলেন। যাকে কোন মতে উপলব্ধি করা যায় না, তাকেই উপলব্ধি করবার জন্য পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন।... কেবল বড় বড় কথার মারপ্যাঁচ। নির্গুণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার, এসব কেবল কথার কথা। এর কোন মানে নেই।''[৮] ভগবৎভক্তির রসে আপ্লুত আমাদের দেশে এই বলিষ্ঠ চিন্তাকে তুলে ধরার কাজটি কিন্তু 'কথার কথা' ছিল না সেদিন। এরই পাশাপাশি গৃহদাহ উপন্যাসের অন্তিম পর্বে যখন অচলার অসহায় অবস্থা পাঠক মনে তীব্র করুণ রস সৃষ্টি করে এবং সেই অসহায় অবস্থাতেও অচলাকে বৃদ্ধ রামবাবু যখন ত্যাগ করে চলে গেলেন ঠিক তখনই পাঠক সমাজের কাছে তিনি প্রশ্ন তুললেন, ''যে ধর্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা কোনখানে? যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত নারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে সে কোন সত্যবস্তু বহন করিতেছে?'' অচলার অসহায়তায় পাঠকের বেদনার্ত মনকে ধর্মমোহ থেকে মুক্ত করার কাজটি শরৎচন্দ্র করেছেন সচেতন ভাবেই।

আবার হাস্যরসে শ্রীকান্ত উপন্যাসে মধু ডোমের মেয়ের বিয়ের দৃশ্যে কন্যাপক্ষের পুরোহিত রাখাল পণ্ডিত ও বর পক্ষের পুরোহিত শিবু পণ্ডিতের দ্বন্দ্ব এবং দক্ষিণার বারো আনা চার আনার বোঝাপড়া আর, 'যতদিন জীবিতং ভাত-কাপড়ং প্রদানং স্বাহা'- মন্ত্রে সিদ্ধ বিবাহ হওয়ার ঘটনাকে শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন। পাঠক পড়তে পড়তেই মন্ত্রের অকার্যকারিতা বুঝতে পারে সহজে। হাস্যরসের সহজ কথায় প্রাচীন কুসংস্কারগুলিকে দূর করার প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। কোথাও তির্যক রসের মাধ্যমে একই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। 'পথনির্দেশ' গল্পে হেম নলিনী গুণেন্দ্রকে বলছে, 'মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব?' তার উত্তরে গুণেন্দ্র বলছে, 'কর্মফল যদি সত্য হয়, স্বামী-স্ত্রীর চির সম্বন্ধ কোন মতেই সত্য হতে পারে না, ...এ সংসারে কত পাষণ্ড স্বামীর সতী-সাধ্বী স্ত্রী থাকে, স্বামীটা হয়তো গরু হয়ে জন্মায় এ তোমাদেরই শাস্ত্রের কথা তুমি কি কামনা কর হেম, সতী-সাধ্বী স্ত্রী তার সারা জীবনের সুকর্মের অন্তে এই গরুর সঙ্গে গোয়ালে গিয়ে বাস করবে?' এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের জনৈক সমালোচক বলেছেন, ''কর্মফল, পুনর্জন্ম ও স্বামী-স্ত্রীর চির সম্বন্ধ নিয়ে কত না গভীর তত্ত্ব আলোচনা হয়েছে। বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে রাধাকৃষ্ণণ সকলেই ভারতীয় দর্শনের গভীর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কতই না গর্ব করেছেন। আর শরৎচন্দ্র একটা সাধারণ সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘরোয়া কথায় কতই না সহজে এই সুপ্রাচীন মিথ্যা কথাটিকে ধূলিসাৎ করে দিলেন।''[১০]

শাস্ত্র, ত্যাগ-মাহাত্ম্য, ও আদর্শের ক্ষেত্রে
শরৎ-চিন্তার বলিষ্ঠতা অনন্য-সাধারণ

আমাদের দেশের নবজাগরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানবতাবাদের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও অনেকে মানবতাবাদী চিন্তার সঙ্গে সনাতন ঐতিহ্যবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁরা শাশ্বত, চিরন্তন সত্যের জয়গান গেয়েছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত করতে চেয়েছেন দেশের জনমতকে। কিন্তু শরৎচন্দ্র ছিলেন তার জ্বলন্ত ব্যতিক্রম। বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধির ভিত্তিতে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, ''সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ, কাল, পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে

অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা।" কিরণময়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন, "যা সত্য, তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক।"[১২]

এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আজও আমরা দেখতে পাই বহু শিক্ষিত মানুষ এমনকি বিজ্ঞানের নানান শাখায় যাঁদের অপরিসীম ব্যুৎপত্তি রয়েছে, তাঁরাও প্রাচীন ভারতের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদকে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করেন। বিদ্যাসাগর ছাড়া এই প্রশ্নে প্রত্যয়পূর্ণ বক্তব্য এই বাংলায় প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই ঘন-তমসার দিনে তিনি বলতে পেরেছিলেন 'সাংখ্য-বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, এ নিয়ে আর কোনও সংশয় নেই'। বিদ্যাসাগরের চিন্তার ধারাবাহিকতায় শাস্ত্র সম্পর্কে এই অন্ধ বিশ্বাসকে শরৎচন্দ্র আঘাত করেছেন নির্দ্বিধায়। বলেছেন, "শাস্ত্রে-টাস্ত্রে অনেক সাধনার কথা আছে- আমার unfortunately মনটা একেবারে উল্টো দিকে গেছে-সাধনার কোন মূল্য খুঁজে পাই না।"[১৩] উল্টে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, "শাস্ত্র সাধনা যা ছিল, সবই যদি এত বড় ছিল, আমরা এত ছোট হলুম কেন?"[১৪]

কিরণময়ীর মুখে তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন পাঠকের চিন্তার দুয়ারে তিনি হাজির করেছেন- "খেতে, শুতে, বসতে ভগবানের দোহাই, আর ধর্মের দাঁত খিচুনি। অথচ এত তেজ যে, কোথাও এতটুকু কারণ পর্যন্ত কেউ দেখাবার দরকার মনে করেন নি। শুধু জবরদস্তি। তোমার গো হত্যার ব্রহ্ম হত্যার পাতক হবে, তুমি উচ্ছন্নে যাবে, তোমার চৌদ্দপুরুষ নরকে যাবে। কেন যাবে? কে তোমাকে বলেচে? শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, সমস্তই এই গায়ের জোর আর চোখ-রাঙানি।"[১৫] অন্যদিকে ব্যক্তিজীবনে স্বর্গ-নরক, ইহকাল-পরকাল নিয়ে শরৎচন্দ্র যে কথা বলেছিলেন, তাতে তাঁর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত মতামত অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যায়। মৃত্যুর দু'বছর আগে তিনি কালিদাস রায়কে বলেছিলেন, "আমার কোন ধর্মাচরণও নেই, স্বর্গও নেই। আমার নরকও নেই-নরকভয়ই মৃত্যুভয়কে ভীষণ করে তোলে, আমার নরক ভয়ও নেই। আমার পরলোকও নেই, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়ার তাগিদও নেই। মৃত্যুকে জীবদেহের অনিবার্য্য পরিণতি বলেই তাকে মেনে নিতে হবে। আমি এই অনিবার্য্য পরিণতির জন্য মনকে প্রস্তুত করছি।"[১৫ক]

ত্যাগ-মাহাত্ম্যে পূর্ণ এই ভারত ভূমিতে আমরা ত্যাগের আদর্শকে একটা উচ্চ পর্যায়ে রেখে বহু জিনিসের বিচার করি। অগণিত মানুষের যথার্থ স্বার্থ রক্ষা করার সংগ্রামে নিয়োজিত করতে গিয়ে ব্যক্তির স্বার্থবোধকে বিসর্জন দেওয়া, আর ত্যাগ-ধর্মের দোহাই পেড়ে বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষকে ভুলিয়ে রাখা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ত্যাগধর্মের দোহাই পেড়ে চলে এই নিষ্ঠুর খেলা। শরৎচন্দ্র এই সনাতনী ধ্যান ধারণাকে ধূলিসাৎ করেছেন। কমলের মুখ দিয়ে বলেছেন, "আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি, দৈন্যভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনও বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা।"[১৬] অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় শরৎচন্দ্র এর অকার্যকরী ও ক্ষতিকর দিকটিকে তুলে ধরেছেন, "এই পুণ্যভূমি ত্যাগ-মাহাত্ম্যেই ভরপুর। উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রে কি আছে জানিনে, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, এই ত্যাগের মন্ত্র দিনের পর দিন সবল সাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে নামিয়ে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে। উচ্চাকাঙক্ষা করবে কি? অভাববোধটাই তাদের শুকিয়ে গেছে। ছোট জাত, অস্পৃশ্য তাতে কি? ভগবান করেছেন। এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা আর একটু বেশি জানে, তারা উদাস চক্ষে চেয়ে বলে, সংসার ত মায়া, দুদিনের খেলা; এ জন্মে সন্তুষ্ট চিত্তে দুঃখ সয়ে গেলে আর জন্মে মুখ তুলে চাইবেন। এক অদৃষ্ট ছাড়া আর কারও বিরুদ্ধে তাদের নালিশ নেই। চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পরে অভাব নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্য করার বর প্রার্থনা করে। তাতেও যখন কুলোয় না, তখন আকাশের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চোখ বোজে।"[১৭]

এই নীরব মৃত্যুর নিষ্ঠুরতার উপর ত্যাগ-মাহাত্ম্যের মোহময় আবরণকে তিনি উন্মোচিত করেছেন। ধর্মের মোহ থেকে মুক্তির প্রয়োজন যে শোষিত বঞ্চিত মানুষেরই সবচেয়ে বেশী, তা শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে। 'পথের দাবী'তে তিনি এর কারণ দেখিয়ে বলেছেন, "চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্বল বলিয়া

মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপরে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সবচেয়ে বেশী।" তাই আশ্রম সম্পর্কে দিলীপ কুমার রায়কে বাংলা ১৩৩৭ সালের ৪ঠা ফাল্গুন এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই... আমি জানি ওসবই সমান, সবই ভূয়ো।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩২ সালে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উদ্যাপন উপলক্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে একটি সভায় মঠের কাজকর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা জ্ঞাপন করে শরৎচন্দ্র বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণের আদর্শ অনুযায়ী মঠের কাজকর্ম হচ্ছে না। একথা সকলেই জানেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শরৎচন্দ্রের কতখানি আস্থা ও স্নেহ-মমতা ছিল। তবু যা তিনি সত্য বলে মনে করেছেন তা সরাসরি ব্যক্ত করেছেন এই সভায়। এরই সাথে নিঃশঙ্ক চিত্তে শরৎচন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "তাঁহার (বিবেকানন্দের) বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যরা যে আধ্যাত্মিক দিকটির উপর সম্পূর্ণ জোর দিতেছেন, তাহার চাইতে বড় জিনিস তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা দেশকে ভালবাসা, আত্মত্যাগ। আমি নিজে পরকালের জন্য ব্যস্ত নই। দেশের স্বাধীনতার মধ্যেই আমি আমার চরম মুক্তি পাইব।"

দেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে শরৎচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবী ধারার সমর্থক- আপসহীন সংগ্রামের পথেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছিল। বহু গৌরবের অধিকারী সেই সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের মধ্যেও সনাতন ঐতিহ্যবাদ এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাব থেকে গিয়েছিল এবং শরৎচন্দ্র তা প্রত্যক্ষও করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ এবং মুক্তির মধ্যেই আদর্শের কার্যকারিতা। তিনি তাই বলতেন, "আইডিয়া পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা দেশের ও জাতির মঙ্গলকর কিনা।"[১৯]

শুধু তাই নয়, বলেছেন, "দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস 'ন্যারো ন্যাশনালিজম'ও নয় 'চাউভিনিজম'ও নয়। বিশ্ব মানবের হিতের জন্যই নিজের দেশ।"[২০] দেশের রাজনীতির মধ্যে ধর্মের প্রশ্নকে যুক্ত করাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর 'বিতর্কিত' লেখার মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে, "রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড়? আর মানুষ হল ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয়নি, এই দুর্ভাগা দেশে তাই কি হল special and peculiar circumstances?"

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বহু বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। মতপার্থক্যের কারণে কখনও যদি কোন উষ্মা প্রকাশ পেয়ে থাকে তার জন্য শরৎচন্দ্র লজ্জিতই হয়েছেন, ত্রুটি স্বীকার করেছেন, শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কিন্তু আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নে আপস করেননি। ঈশ্বর বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাই। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে শরৎচন্দ্র কবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও একসময় বলেছেন, ক্ষ্মরবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় ঈশ্বরবিশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে আমার মনে তর্ক ভগবানের রুদ্ধ দ্বারে এসে আছড়ে পড়ে। তাঁর একান্ত হয় না। এই পরম ভাগবত কবির সহস্র political যুক্তি তাঁর ইচ্ছা কি তা আমরা জানিনে, তাঁর ইচ্ছার দোহাই বিশ্বাস, বিধাতার কল্যাণ হস্তই সবকিছু করে চলেছে, কিন্তু politics-এ আসা কোন কারণেই আমার ভাল মনে হয় না।... প্রাচীনকালের দর্শনের বড় বড় যুক্তি-তর্ক যেমন বেদের বাণীর দরজায় এসে নিজেদের পথ হারিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতো। বড় বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তের দলই এ যাবৎ দেশের পলিটিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করচে। যাঁদের হওয়া উচিৎ ছিল সন্ন্যাসী, তাঁরা হলেন পলিটিশিয়ান। তাই ভারত পলিটিক্সে এত বড় দুর্গত।"[২২] অত্যন্ত পরিষ্কার করেই তিনি আদর্শের প্রশ্নে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন যেখানে কোন রকম অস্পষ্টতাই নেই নেই কোন দ্বিধা-সংকোচ। পরিণত মনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে আমরা সেখানে পাই পার্থিব মানবতাবাদের উন্নততর রূপ অজ্ঞেয়বাদ বা অ্যাগনষ্টিসিজমের সুর। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "আদর্শের উল্লেখ যখন করব তখনই বৃহৎ আদর্শ, কল্যাণের আদর্শ, গৌরবের আদর্শের কথাই স্মরণ করব। কেবল মহামানবতার আদর্শ গ্রহণ করব, তাকে ভারতের আদর্শ,

-এশিয়ার আদর্শ, হিন্দুর আদর্শ-এদিক দিয়ে কিছুতেই বিচার করব না। কারণ সেই তো ক্ষুদ্র মনের সঙ্কীর্ণ হীন আদর্শ; কোনমতেই সর্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়।"[২৩]

জাত বিচারের প্রশ্নে শরৎচন্দ্র

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই শরৎচন্দ্রকেই তথাকথিত একদল প্রগতিবাদী 'রক্ষণশীল', 'গোঁড়া হিন্দু' বলে অভিহিত করলেন। একটা সহজ প্রশ্ন এঁরা সকলেই এড়িয়ে যান তাহ'ল, যদি তিনি রক্ষণশীলই হয়ে থাকেন, তাহলে গোঁড়া, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এত শরৎচন্দ্র বিরোধী কেন? সমস্ত সমাজপতিরাই যে গেল গেল রব তুলেছিলেন সেদিন, এ তো ইতিহাস। শরৎ সাহিত্য পাঠ সেদিন সমাজ মননে পুরাতন ধ্যান ধারণাকে যে কশাঘাত করেছিল একথা শুধু হিন্দু সমাজ নয়, তদানীন্তন মুসলমান সমাজও তার স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতি ছিল অগ্নিযুগের বিপ্লবী মনের মণিকোঠায়- তাঁর সাথে গভীর স্নেহের বন্ধনের মধ্যে। এমনি ধারা কশাঘাত করতে প্রগতিশীল মুসলমান সমাজ শরৎচন্দ্রকে আবেদনও করেছিল। একথাও অজানা নয় যে, গোঁড়া হিন্দু সমাজ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এতদূর পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে, তাঁকে 'একঘরে' করে রেখেছিল- তাঁর ধোপা নাপিত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজকেও যারা প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানে আছেন, যারা এই অসাম্য ও শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক তারা সকলেই হয় প্রত্যক্ষভাবে নতুবা বাক্যবিন্যাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পরোক্ষভাবে শরৎচন্দ্র বিরোধী। এরইবা যথার্থ কারণ কোথায় নিহিত, এ প্রশ্ন বারে বারে মনে জাগে। আর তখনই এ ধারণা দৃঢ় হয়, এই শাসকবর্গ যারা স্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে লাভবান হয়, তারা পরিবর্তনকে ভয় পায় আর এই কারণে তারা ভয় পায় শরৎচন্দ্রের বিপ্লবাত্মক মানসিকতাকে, ভয় পায় শরৎচর্চাকে। তাই তারা শরৎচন্দ্র বিরোধী।

হিন্দু সমাজের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি ও জাতবিচার একটা প্রবল সমস্যা হিসাবে বিরাজ করত সেদিন। এই প্রশ্নেও একদল সমালোচক শরৎচন্দ্রের দুএকটি মন্তব্যকে ভিত্তি করে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তবে একথা সত্য যে, সাহিত্যে এবং জীবনে এই ভেদাভেদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করলেও কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কিছু কিছু এমন তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেছেন, যা পার্থিব মানবতাবাদের প্রবক্তা শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে এক কথোপকথনে তিনি বলেছেন, "ভেদাভেদ চলে গেলে এক মুহূর্তে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। তখন আর আমার সমাজ ওমুকের সমাজ বলে ভেদাভেদ থাকবে না। সেটা কি ভালো?"[২৪] যদিও এই ধরনের মন্তব্য কখনও কখনও তাঁর কেন এসে যায়, তার কারণ নিজেই তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এর দ্বারাই তাঁর চরিত্রের আবেগের দিকটি ফুটে ওঠে। তিনি কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরীকে বলেছেন, "আমি যখন (সামাজিক) সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিই তা আমি মনের সঙ্গেই দিই-আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই দিই। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আমার মনের কোন এক অজ্ঞাত কোণ থেকে যেন conservativeness মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আমাকে দুর্বল করে ফেলে।"[২৫] এই দোদুল্যমানতাকে অকপটে স্বীকার করলেও শরৎচন্দ্র ছিলেন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত এক প্রতিবাদ স্বরূপ সমাজের নিয়ম-নীতি বহুক্ষেত্রেই তিনি মেনে চলেননি। ব্যক্তি জীবনের খুঁটিনাটি কিছু আচরণে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেলেও যথার্থই তিনি জাতিগত ভেদাভেদের উর্ধ্বে এবং তিনি এই ক্ষেত্রে দ্বিচারিতাকে আঘাত করেছেন নির্মমভাবে। বলেছেন, ক্ষ্মবুঝি ছোঁয়াছুঁয়ি আচার-বিচারের অর্থ নেই তবু মেনে চলি, বুঝি জাতিভেদ মহা অকল্যাণকর। তবু নিজের আচরণে তাকে প্রকাশ করিনে। বুঝি ও বলি, বিধবা বিবাহ উচিত। তবু নিজের জীবনে তাকে প্রত্যাহার করি, জানি খদ্দর পরা উচিত, তবু বিলাতি কাপড় পরি, একেই বলি আমি অসত্যাচার।"[২৬]

কোন কোন সমালোচক লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে খাওয়া-দাওয়া প্রসঙ্গে লেখা চিঠির একটি লাইন উদ্ধৃত করে শরৎচন্দ্রকে 'গোঁড়া হিন্দু' এবং 'জাত বিচারে বিশ্বাসী' বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকেন। সেখানে শরৎচন্দ্র বাবা-মা'র ব্রাহ্মণ কন্যা এবং যার স্বামী ব্রাহ্মণ তারই হাতে খান বলে বলেছেন। অথচ বাস্তবে শরৎচন্দ্রের জীবনের বহু দিনই কেটেছে দুলে, বাগদীদের পাড়ায়। তাই চিঠির ওই অংশটুকু বা নিজের সামান্যতম মানসিক দুর্বলতার স্বীকৃতিকে পুঁজি করে শরৎ-মানসিকতার সামগ্রিক বিচার যথাযথ হতে

পারে না। ধীরভাবে বিচার করলে তারই পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা সেই চিঠির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তদানীন্তন সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের কৃত্রিমতার প্রতিবাদ। তাঁরই কথায় - ‘‘শুধু তাদের ন্যাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার-বর্জিত আলোর দম্ভ এবং যা সত্য নয় তার ভান- এই দেখেই আমার এত অরুচি।’’[২৭] এই চিঠিতেই তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘‘দিদি, আমি কোন কালে খাওয়া ছোঁয়ার বাচ-বিচার করি নে, কিন্তু ব্রাহ্ম মেয়েদের হাতে আমি কোন দিন কিছু খাইনে... আমি গোঁড়া নই লীলা, শুধু রাগ করেই এদের হাতে খাইনে।’’ এই রাগের অভিব্যক্তি নিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকলেও বা এই ধরনের অভিব্যক্তির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও শরৎচন্দ্র ‘গোঁড়া ছিলেন’, ‘জাতবিচার করতেন’, ‘ছোঁয়াছুঁয়ি মেনে চলতেন’, এসব কথা যে সত্য নয় তা আমরা আরও পাই তাঁর অপর আর একটি চিঠিতে। সেখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এই সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মানসিকতা- ‘‘কোন জাতিকে আমি অস্পৃশ্য মনে করি না এবং কাহারও হাতে জল খাইতে আমার বাধে না। বরঞ্চ, লোকের যখন বাধে তখন সেইটাই আমাকে সবচেয়ে বাধে।’’ চন্দননগরের আলাপসভার ঘরোয়া আলোচনাতে তিনি ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছিলেন, ‘‘আমার কথা পুরানো জিনিস নিয়ে গৌরব করে কাজ হবে না। নূতন গড়ে তোল। জাত সম্বন্ধেও তাই। নাইবা থাকল জাত- এমন ছেলে দেখা যায়, যার বংশ পরিচয় দেবার মত কিছু নেই- সে নিজের জোরে বড় হয়েছে, successful হয়েছে-আমারও মনের ভাব তাই।’’ শ্রীকান্ত উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে শ্রীকান্তের সঙ্গে কথোপকথনে অভয়ার আত্মবিশ্বাসে ভরা অভিব্যক্তি- বাংলা সাহিত্যে আজও নিতান্তই বিরল। তেমনি বিরল ইন্দ্রনাথের সহজ সরল উক্তি, ‘‘মরার আবার জাত কিরে?’’ ফলে সামগ্রিকভাবে বিচার না করে বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করলে তা সত্যকে প্রতিফলিত করে না। উক্ত সমালোচকদের আমরা বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

বিতর্কিত তিনটি রচনা, প্রেক্ষাপট, নিহিত কিছু প্রশ্ন ও ব্যতিক্রমী শরৎচন্দ্র

‘রক্ষণশীল’, ‘গোঁড়া হিন্দু’- এই বিশেষণের পাশাপাশি শরৎচন্দ্রকে ‘ইসলাম ধর্ম বিরোধী’ ‘মুসলমান বিদ্বেষী’, ‘সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন’ ইত্যাদি বিশেষণেও বিশেষিত করেছেন একদল ‘প্রগতিবাদী’। শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস থেকে তাঁরা মূলতঃ তিনটি রচনা বা ভাষণকেই তুলে ধরেন। ‘বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা’, ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১)’, ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (২) এই তিনটি। তার সাথে গল্প-উপন্যাসে কত সংখ্যায় তিনি মুসলমান চরিত্র অঙ্কন করেছেন এবং তারা সমাজের কোন স্তরের মানুষ তার দ্বারা মুসলমান ধর্ম এবং সমাজের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে এইসব সমালোচকরা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এগুলি যে শরৎচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্য সাধনার মূল ধারা নয়, বরং তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারার ব্যতিক্রমী কিছু মন্তব্য এই সমালোচকরা তা যেমন বিচার করেননি, তেমনি তাঁরা এই রচনাগুলির প্রেক্ষাপট, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থারও বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। আর সেই কারণেই এই ভাষণ বা রচনায় শরৎচন্দ্রের পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাধারার মূল সুরের বিরোধী কিছু মন্তব্যের মধ্যেও যে অন্তর্নিহিত কথা রয়েছে তার অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ‘বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা’ প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্র এমন কিছু কথা বলেছেন, যা যথার্থই বিস্মিত করে। বিস্মিত করে এই কারণে যে, সেই বক্তব্যগুলিতে বলিষ্ঠ মানবতাবাদী হিসাবে পরিচিত শরৎচন্দ্রকে আমরা পাইনা। যেমন তিনি বলেছেন, ‘‘বস্তুতঃ মুসলমান যদি কখনও বলে - হিন্দুর সঙ্গে মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন’’, ‘‘একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই’’, ‘‘...হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজের কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে’’, ‘‘হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে এ দেশে তাহার চিত্ত নাই।’’

এই রচনাটির সময়কাল হ'ল ১৯২৬ সাল। এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতায় 'হিন্দু সংঘ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিপ্লবী অনুজাচরণ সেনগুপ্ত। এই সংখ্যায় সজনীকান্ত দাসের 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামেও অপর একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই রচনা দুটি প্রকাশের জন্য অনুজাচরণের ছয় মাস কারাদণ্ড হয় এবং পত্রিকাটি বাজেয়াপ্ত করে ব্রিটিশ সরকার। মনে রাখা দরকার, ১৯২৩ সাল থেকে ব্রিটিশ প্ররোচনায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা চলতে থাকে। জাতি বিদ্বেষের উপ্ত বীজ সমাজ মননে বিভেদের পরিবেশ তৈরী করে চলেছে তখন। এরই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল খিলাফৎ আন্দোলনকে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচীতে যুক্ত করেছেন গান্ধীজী। ১৯২৪ সালে আতাতুর্ক মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে খলিফাদের শাসনের বা খিলাফৎ-এর অবসান হয়। কামাল পাশা ছিলেন আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং নবজাগ্রত তুর্কী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তিনি ধর্মীয় অন্ধতাকে অপসারণের প্রয়াস চালিয়েছিলেন ঐকান্তিকভাবে। প্রগতিশীল তুর্কীরা এই প্রয়াসে নিজেদের নিয়োজিত করলেও ধর্মীয় অন্ধতায় আচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত মুসলমান সমাজের একটি অংশ বিভিন্ন দেশে খলিফাদের সমর্থনেই আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা চালাতে থাকেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হ'লেও একথা সত্য যে, গান্ধীজী সেই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকে সমর্থন করেন। আমাদের দেশে ১৯১৯ সালের ২৩ শে নভেম্বর দিল্লীতে সারা ভারত খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং গান্ধীজী এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। মুসলমান সমাজের একটি অংশ স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে একটি শর্ত রেখেছিল যে, তারা ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করতে পারে, যদি কংগ্রেস মধ্যযুগীয় এই ইসলামিক রীতিনীতি পুনরুজ্জীবনের এজেণ্ডা নিয়ে গড়ে ওঠা খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বহু মানুষ এর প্রবল বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্রও এই খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনে খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারই সাথে এই সময়ে দেখা গেল যে, খিলাফৎ আন্দোলনকে গান্ধীজী যে অর্থে সমর্থন করেছিলেন তা সফল হল না। প্রকৃতপক্ষে, গান্ধীজী চেয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। সেই কারণেই আপসরফা করে খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তার পরিণতিতে হিন্দু এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির কর্মতৎপরতা দেখা যায়। একদিকে 'আর্যসমাজ', 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' আন্দোলন জাতিচ্যুত হিন্দুদের আবার হিন্দু করে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। অপরদিকে মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি 'তন্‌ষীম', 'তব্লীগ' আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে।

১৯২৫ সালের ২রা মে থেকে ফরিদপুরে বিপিসিসি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' সম্পাদন করেন। তিনি ঐকান্তিকতার সঙ্গেই চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলন। কিন্তু তা ছিল নিছক রাজনৈতিক সমঝোতা। কাজী নজরুল ইসলাম এই সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে লিখেছিলেন, ''বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আসনাই।'' ১৯২৬ সালের এপ্রিলে দাঙ্গার পর মে মাসের ২২-২৩ তারিখে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' বা 'সিরাজগঞ্জ প্যাক্ট বাতিল হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে বহুজাতিক, বহুভাষিক ও বহুধার্মিক ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের সমস্যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ের একটা অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে ছিল। মিলনের ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও যেভাবে রাজনৈতিক সমঝোতার পথে জোড়াতালি দিয়ে সে ঐক্যের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে অনেকেই মত প্রকাশ করেছিলেন সেদিন। মহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব বলেছেন, ''যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদের টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হ'ল। তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল না। একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে। সভায় সমিতিতে, কংগ্রেসে, কনফারেন্সে, গোলটেবিলে, মিলন বৈঠকে এদের যে ঐক্য

সাধনা, বস্তুতঃ সেটি হল সান্নিধ্য সাধনের প্রয়াস; তাতে অঙ্কের যোগ-বিয়োগের হিসাব প্রচুর, মনের যোগ-বিয়োগের চিত্তের লেন-দেনের কথা সেখানে নেই।"[৩১] রবীন্দ্রনাথও তাঁর লোকহিত প্রবন্ধে বলেছেন, ''আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল, সত্য ছিল না।"

এইভাবে যে যথাযথ ঐক্য সম্ভব নয় তা শরৎচন্দ্র নিজেই দেখিয়েছেন। এই মিলনের নামে নেতারা যতই উল্লসিত হোন বাস্তবে তা যে কত কঠিন সেকথা অন্যান্য প্রাজ্ঞজনের মতো শরৎচন্দ্র ও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, ''শুনিতে পাইলাম, হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি একদিন জাতীয় মহাসভার মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। সবাই বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বলিতে লাগিল যাক বাঁচা গেল। চিন্তা আর নাই, নেতারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, এবার শুধু কাজ আর কাজ, - শুধু দেশোদ্ধার। প্রতিনিধিরা ছুটি পাইয়া সহাস্য মুখে দলে দলে টাঙা, এক্কা এবং মোটর ভাড়া করিয়া প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ সকল দেখিতে ছুটিলেন। সে ত আর এক আধটা নয়, অনেক। সঙ্গে গাইড, হাতে কাগজ পেন্সিল- কোন্ কোন্ মসজিদ, কয়টা হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া তৈয়ার হইয়াছে, কোন্ কোন্ ভগ্নস্তুপের কতখানি হিন্দু ও কতখানি মোসলেম, কোন বিগ্রহের কে কবে নাক এবং কান কাটিয়াছে ইত্যাদি বহু তথ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রান্ত দেহে দিনের শেষে গাছতলায় বসিয়া পড়িয়া অনেকেরই দীর্ঘশ্বাসের সহিত মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে শুনিলাম- উঃ! হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি!"[৩২]

বস্তুতঃ খিলাফৎ আন্দোলন এবং জোড়াতালি দেওয়া ঐক্যের জন্য তদানীন্তন নেতৃত্ব যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধেই শরৎচন্দ্র এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে, যে কারণই থাকুক বা ক্ষিপ্ত হওয়ার যে উপাদানই থাকুক শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের কাছ থেকে এ ধরনের মন্তব্য না এলে বিভ্রান্তির সুযোগ থাকত না। একথাও নিঃসন্দেহে সত্য যে, তাঁর এই মন্তব্যগুলি যথাযথ নয়। যদিও প্রকাশভঙ্গিমা এবং কটাক্ষের প্রশ্ন বাদ দিলে এই প্রবন্ধটিতেও দু'একটি বিষয় আছে যা বিবেচনা করে দেখবার মতই। যেমন তিনি বলেছেন, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য ''মহাত্মাজীর খিলাফৎ আন্দোলন 'দেশবন্ধুর প্যাক্ট্' একটা ঘুষের ব্যাপার। ...এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়?" এ প্রশ্নকে অস্বীকার করার উপায় যেমন সেদিনও ছিল না আজও তেমনি নেই। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এই যুক্তির সারবত্তা প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি এও মনে রাখতে হবে যে, 'সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদে মদনমোহন মালব্য সহ কয়েকজন কংগ্রেস থেকে বাঁটোয়ারা'-র প্রশ্নে কংগ্রেসের না গ্রহণ, না বর্জন নীতির একটা আলাদা দল গঠন করেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁদের বেরিয়ে এসে Congress Nationalist party নামে সমর্থন করেননি। বরং মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, ''কংগ্রেস সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস চিরকালই লড়াই করে এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে।.... দেশ সেবা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায় ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়।.... আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে তখনও ঘটে বিপদ।"[৩২ক] তিনি তাঁর ক্ষিপ্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশে যেমন অপ্রত্যাশিত উক্তি করেছেন যা যথাযথ নয়, তেমনি আবার এই মনোভাবও ব্যক্ত করেছেন যে, ''আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী (হিন্দু ও মুসলমান) জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না।" বিচারের সময় এই কথাগুলিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত আর একটি ঘটনাও এখানে প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে সংহত করা। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। শরৎচন্দ্রও নিজে এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। ফলে, 'হিন্দু-মুসলমানের' ঐক্য চাইতেন না বলে শরৎচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সে ধারণা সত্য নয়। ধর্মের মোহ থেকে মুক্তি ছাড়া এবং ধর্মীয় সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে এগিয়ে আসা ছাড়া যে প্রকৃত অর্থে মুক্তিসংগ্রাম সম্ভব নয় সেই কথাটিও এই প্রবন্ধের মধ্যে নিহিত আছে। তিনি বলেছেন যে, মুসলমান

সমাজ অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানদেরও মুক্তি ভারতের মুক্তির সঙ্গে যুক্ত -এসত্য সেদিনই তারা বুঝতে পারবে, ক্ষ্মযখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে। যখন বুঝিবে যে কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।ক্ষ্ম হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ সত্য সেদিন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারার পরিণাম আজ মর্মে মর্মে ভোগ করতে হচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের অগণিত মানুষকে।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১) এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (২) হ'ল তাঁর দুটি ভাষণ। এই দুটি ভাষণ ১৯৩৬ সালের ১৫ এবং ১৭ জুলাইয়ের। ১৯৩৭সালের ১ এপ্রিল থেকে ভারতবর্ষের নতুন শাসনতন্ত্র চালু করার জন্য ১৯৩৫ সালে যে ভারত-শাসন আইন পাস হয়, তার বিরুদ্ধে এই দুটি সভা আহূত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যে খসড়া তৈরি হয়েছিল তার রচয়িতা ছিলেন সাইমন, আরউইন ও লোথিয়ান। হোর তাকে সংশোধন করেন। বাংলাদেশের হিন্দুরা তাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা বোধ করেন। সারা দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নূতন করে তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে হিন্দু জনসাধারণ একটা লিখিত আবেদন বা মেমোরিয়াল বিলাতে ভারত সচিবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাতে প্রথম নাম ছিল রবীন্দ্রনাথের। শরৎচন্দ্রও তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। আবেদনে জানানো হয়েছিল যেহেতু বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেহেতু আসন সংরক্ষণ করলে তা সংখ্যালঘুদের জন্যই করা উচিত- সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য নয়। তারই সাথে যৌথ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বলা হয়েছিল, গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে পৃথক পৃথক নির্বাচনের নজির নেই, ইত্যাদি। এই আবেদনের উত্তরে ভারত সচিব ২৫ জুন ১৯৩৬, ভারত সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, '১৯৩৫ সালে যে অ্যাক্ট্ পাশ হয়েছে তার কোন রকম পরিবর্তন হবে না'। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ব্যাপক প্রচেষ্টা হয় বাংলায়। ১৯৩৬ সালের ১৫ জুলাই কলকাতার টাউন হলে একটি সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাতে শরৎচন্দ্র ৫ জুলাই তুলসী গোস্বামী ও রাধাকুমুদ মুখার্জীকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ রাজী হয়েছিলেন এবং এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। এখানে শরৎচন্দ্র তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় তিনি সেদিন দিয়েছিলেন গভীর শ্রদ্ধায়। সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, 'বাংলায় হিন্দু জনগণের আজকের এই সম্মিলন যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন।' কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনায় ধর্মের প্রশ্ন নিয়ে বিচারকে এই ভাষণেই তিনি তীব্র ভাষায় বিরোধিতা করেছিলেন। এই সভার দুদিন পরে একই উদ্দেশ্যে আর একটি সভা ১৭ জুলাই ১৯৩৬, এ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শরৎচন্দ্রই ছিলেন সভাপতি। এই সভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, ''বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটা হীন প্রচেষ্টা চলছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি আরবী শব্দ ব্যবহার কর, কেউ বলছেন এতগুলি ফারসী শব্দ ব্যবহার কর, আবার কেউ বা বলছেন এতগুলি উর্দু শব্দ ব্যবহার কর।'' এই প্রশ্নটি নিয়ে মুসলমান সমাজের কয়েকজন বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন একথা সত্য। আবার অপরপক্ষে, বাংলাদেশের শতকরা ৫৫ জন মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে বাংলাভাষায় ৫৫টি আরবী, ফারসী, উর্দু শব্দ ব্যবহারকে কটাক্ষ করে 'শনিবারের চিঠি'তে মোহিতমোহন ঘোষের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এই লেখায় ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাতে সাহিত্যে নানান শব্দ ব্যবহার করলে তার অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে, তার একটি নমুনা তুলে ধরা হয়। সেই লেখাটি পড়লে বাংলা ভাষাভাষী যে কোন ব্যক্তিই তার প্রতিবাদ করবেন। এই আরবী, ফারসী বা উর্দু শব্দ সংখ্যার অনুপাতে ব্যবহার করা যে কত দূর অসঙ্গত, তা ওয়াজেদ আলী সাহেবের কথা উদ্ধৃত করে শরৎচন্দ্র তাঁর একটি ভাষণে দেখিয়েছেন। ওয়াজেদ আলী সাহেব স্পষ্টভাবেই বলেছেন, ''মুসলিম সাহিত্য সেবক আরবী ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার সঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি অতি তুচ্ছ কথা, কেন না, শুধু কলম চালিয়ে ওটি হতে পারে না। তার জন্য চাই-প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। এদুটি যেখানে নেই সেখানে ভাষা ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজে সঙ সাজতে পারে।'' একই সুরে শরৎচন্দ্র বলেছেন, ''যিনি সাহিত্যরসিক,

তাঁর ভাষাকে যিনি ভালবাসেন, অকপটে সাহিত্যের সেবা করেন ক্ষুদ্র বলেছেন, ক্ষতাঁকে ত আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু তাঁদের যাঁরা সাহিত্য সেবা না করেও সাহিত্যের মুরুব্বী হয়ে বসেছেন।"

দ্বিতীয়তঃ শরৎচন্দ্র বাংলাভাষা সাহিত্যে আরবী, উর্দু, ফারসী শব্দ ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন এবং এখানেই তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ একথাটিও যে কতদূর মিথ্যা, তা তাঁর কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা চিঠিতে পাওয়া যায়। তিনি এই চিঠিতে বলেছেন, "আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা, আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুই জাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়। অবশ্য সকল সাহিত্যিকই এই মতের সপক্ষে নয়, কিন্তু, আমি নিজে এইরূপ রচনার পক্ষপাতী। তবে একটি কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সকল জাতির মধ্যেই ভালমন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখিবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি- সমস্তই।"[৩৩]

এর পরেও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলে শরৎচন্দ্রকে অভিহিত করা কি কোনভাবেই যথাযথ হতে পারে? নাকি, ১৭ জুলায়ের অ্যালবার্ট হলের সভায় ডাঃ বি এস মুঞ্জে উপস্থিত ছিলেন বলেই একথা বলা যায় যে, শরৎচন্দ্র হিন্দু মহাসভার দিকে ঝুঁকেছিলেন? অথবা অন্য কোন রকম তথ্য না পেয়ে একে অবলম্বন করেই কি বলা যায় যে, 'শরৎচন্দ্র হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন'? আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে, যাঁরা এ ধরণের মন্তব্য করেছেন তাঁরা এ প্রসঙ্গে কোন রকম তথ্য প্রমাণ দেওয়ার সামান্যতম প্রয়োজনটুকুও বোধ করেননি। অথচ বলেই চলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি অভিভাষণে শরৎচন্দ্র মূলতঃ ইংরেজ শাসনের সুকৌশলে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করার অপকৌশলের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। দেশে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টি করবার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার যে সুদক্ষ এবং হিন্দু-মুসলমান কোন অংশের জনসাধারণের যে এতে লাভ নেই- একথাগুলিকেই তিনি স্পষ্ট ভাষায় উত্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি যে হিন্দু বা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই - একথাও তিনি তুলে ধরেছেন।

শরৎ-সৃষ্ট মুসলমান চরিত্রগুলির মানবিক গুণাবলীকে তুলে ধরা সম্ভবই হ'ত না, যদি তাঁর মনে সুপ্ত অবস্থাতেও মুসলমান বিদ্বেষ বিরাজ করত

বাংলা ভাষার মধ্যে কতগুলি আরবী, ফারসী বা উর্দু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা দিয়ে যেমন কোনও সাহিত্যিকের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রমাণ করা যায় না, তেমনি, তাঁর গল্পে-উপন্যাসে কতগুলি মুসলমান চরিত্র তিনি এঁকেছেন তার দ্বারাও তাঁর মুসলমান সমাজের প্রতি অবজ্ঞা বা মুসলমান বিদ্বেষকে প্রমাণ করা যায় না। গায়ের জোরে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এ ধরনের আলোচনা তাঁরাই মূলত করেন, যাঁরা যেকোন উদ্দেশ্যেই হোক বিরোধিতা করবার জন্যই বিরোধিতা করেন। সমালোচনা করার জন্যই তাঁরা সমালোচনা করেন এবং খুঁজে খুঁজে এই তথ্য আবিষ্কার করেন। অথচ তার পরিবর্তে সেই সাহিত্যিকের মূল চিন্তাধারা, তাঁর জীবন সংগ্রাম, চরিত্র সৃষ্টির মূল দার্শনিক ভিত্তি এবং রসের মাধ্যমে যে মূল্যবোধকে তিনি পাঠক চিত্তে গড়ে তুলতে বা তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা যদি নিরূপণ করার প্রয়াস নিতেন এবং সেই প্রেক্ষিতে তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলিকে চিহ্নিত করতেন, তাহলে সমাজ প্রগতির অর্থে তাঁদের সে প্রয়াসের একটা কার্যকরী মূল্য থাকত। তারই সাথে যদি এই সব তথাকথিত প্রগতিবাদীরা শরৎসাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা বাস্তবে কতদূর বিস্তৃত ছিল এবং সমাজপতি রক্ষণশীলদের শরৎচন্দ্রকে নানানভাবে আক্রমণের কারণ কী ছিল-তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করতেন এবং তার থেকে নির্যাস ও শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করতেন তাহলে তাঁরা যথার্থই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-শরৎ-নজরুলোত্তর যুগের কার্যকরী সাহিত্য সৃষ্টিতে খানিকটা সাহায্য করতে পারতেন।

একথা সত্য যে, শরৎ সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রের সংখ্যা খুব বেশী নয়। খুবই অল্প। তাদের জীবন ও কর্মধারাও

বিস্তৃত ভাবে উল্লিখিত নয়। কিন্তু তদানীন্তন সমাজে হিন্দু সলমানের স্বাভাবিক অবস্থানকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই শরৎসৃষ্ট সাহিত্যের আঙিনা দিয়ে যখন আমরা রসের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবিষ্ট হই, তখন আমরা ভাবতেই ভুলে যাই যে, আমরা তাঁর স্বল্প উল্লিখিত মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরে ঠিক কখন পা ফেলেছি। আসলে যে সমাজ পটভূমিতে শরৎ সাহিত্যের চলাফেরা তা ছিল সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে জর্জরিত। সমাজ প্রগতির অভিমুখ তখন ছিল বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা পার্থিব মানবতাবাদের পথ বেয়ে। এই বলিষ্ঠ মানবতাবাদী চিন্তা রূপ পেয়েছিল তদানীন্তন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অংশের মানুষের মধ্য দিয়ে। সেই নবীন আদর্শে মুষ্টিমেয় উদ্বুদ্ধরাই তখন এনেছিল নতুন প্রাণের স্পন্দন। তারা ছিল পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের সমর্থক। তারাই ছিল স্বাধীনতা-বিপ্লব কম্পিত বাংলার গর্ব - ‘Flowers of Bengal.’ সেই সময়ে তাই কতজন চাষীকে, কতজন মজুরকে সাহিত্যে আনা হয়েছে, কতখানি চাষী সমস্যা সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে তাদের জন্য কত পৃষ্ঠা সাহিত্যিক খরচ করেছেন-এগুলি আদৌ বিচার্য বিষয় ছিল না। নবজাগরণের আদর্শে, দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণ সমাজ এবং তাদের চরিত্রে ধর্মনিঃস্পৃহ মানসিকতার মধ্য দিয়ে রচিত মানবতাবাদী মূল্যবোধ সৃষ্টিই ছিল যুগ-সত্য। আমাদের দেশের ইতিহাসের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সেই সময়ে শিক্ষা এবং নবজাগরণের চিন্তার সঙ্গে সংস্পর্শ যাদের ঘটেছিল, যে কোন কারণেই হোক তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন হিন্দু অংশের জনসাধারণ। আর শরৎ সাহিত্য বাস্তবতামুখী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিঃসৃত। ফলে তাঁর সাহিত্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সংখ্যার অনুপাতে মুসলমান চরিত্র কম এসেছে।

অন্যদিকে যখন এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, ‘শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের স্থানে স্থানে মুসলমান সমাজের যে ছবি এঁকেছেন, তা মুসলমান সমাজের খুব উঁচু দরের লোক নয়’ - তখন শরৎচন্দ্রই তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন, ক্ষ্মউঁচু নীচু স্তরের পাত্রপাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভালমন্দ নির্ভর করে?ক্ষ্ম এই সুকঠিন যুক্তিটিকে অস্বীকার সেদিনও যেমন কেউ করতে পারেনি, আজও তেমনি।

এরই পাশাপাশি আমরা যদি তাঁর সৃষ্ট মুসলমান চরিত্রগুলিকে বিচার করে দেখি তাহলে দেখতে পাব কোথাও সেই চরিত্রগুলি অবাস্তবও নয় এবং গল্প-উপন্যাসে কোথাও তাদের বিকৃতও করা হয়নি। হিন্দু প্রধান বা হিন্দু শাসিত সমাজের অভ্যন্তরে মুসলমান চরিত্রগুলি স্বাভাবিকভাবে সহজেই স্থাপিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার, হিন্দু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব যদি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের থাকত তবে তাঁর সৃষ্ট মুসলমান চরিত্রগুলিকে এমন অবিকৃতভাবে তিনি উপস্থিত করতে পারতেন না। একথা তো অনস্বীকার্য যে, সাহিত্যিকের মনের মধ্যে যদি কোন বিদ্বেষ বা ক্ষোভ সুপ্ত অবস্থাতেও থাকে তাহলে তাঁর সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হবেই। যতবড় সুকৌশলী লেখক হোন না কেন বিরাগ ও বিদ্বেষের মনটির প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে বা চরিত্রের সংলাপের মধ্যে ঘটতে বাধ্য। শরৎসাহিত্যে এমনটির কোন নজির কিন্তু নেই। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

অনেকে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে ‘বাঙালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচের’ বর্ণনা প্রসঙ্গে অভিযোগ করেছেন যে, ‘অমুসলমান লেখক মাত্রই বাঙালী বলতে হিন্দুকে বোঝাতেন। শরৎচন্দ্রেরও যে এই মনোভাব ছিল না তা বলা যায় না।’ এই প্রশ্নটির একটি প্রামাণ্য ও যুক্তিনির্ভর উত্তর দিয়েছেন সফিকুন্নবী সামাদী তাঁর ‘ঢাকা বাংলা অ্যাকাডেমি’ থেকে প্রকাশিত ‘‘কথা সাহিত্যে বাস্তবতা: শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দ’’-গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, ‘‘বলা বাহুল্য, তৎকালীন বাঙালীর সামাজিক প্রবণতাই ছিল এ রকম। বাঙালী হিন্দুরা, বাঙালী মুসলমানকে বহিরাগত ভাবত। আর কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলমানও নিজেকে বাঙালী না ভেবে আরব-ইরাণ-তুরাণের বংশোদ্ভূত ভাবতে ভালবাসত, গর্ববোধ করত। এই মনোভাব বর্তমান কালেও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। শরৎচন্দ্র এই সত্যের বাস্তব উপস্থাপনা করেছেন মাত্র। এছাড়া এ বিষয়ে আরও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, ‘শ্রীকান্ত’ প্রথম পর্বের প্রথম দিককার গল্প ভাগলপুরের পটভূমিকায়। তৎকালীন ভাগলপুরের মুসলিমরা প্রকৃতই বাঙালী ছিল না, অধিকাংশই উর্দুভাষী, কিছু কিছু ছিল ভোজপুরী। আর

অধিকাংশ হিন্দু ছিল বাঙালী হিন্দু। ফলে শরৎচন্দ্রের বর্ণনায় এই সামাজিক সত্যটির ছায়াপাত অসম্ভব নয়, অস্বাভাবিকও নয়।"

'গফুর', 'আকবর', 'ফকির সাহেব', 'গহর'রা শরৎ সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়েই আছে

আশ্চর্যের বিষয় হল, যাঁরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মুসলমান বিদ্বেষের কথা ফলাও করে অহরহ বলে চলেছেন, তাঁরা কেউই কিন্তু তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সৃষ্ট মুসলমান চরিত্রগুলির উৎকর্ষতাকে বিচারের মধ্যে গণ্য করেন নি। মনে হয়, তাঁরা যেন খানিকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করেননি। আমাদের প্রশ্ন জাগে, সেযুগের বা এযুগের রক্ষণশীল শাসকশক্তির কাছে শরৎচন্দ্রের চর্চার বিপজ্জনক দিকটিকে বুঝে সেই চর্চা থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই তাঁরা এগুলো করেছেন বা করছেন কিনা। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, অগণিত পাঠক অনুভব করেছেন যখনই যেখানে গল্প-উপন্যাসে মুসলমান চরিত্র বা ইসলাম ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে- কোথাও কোন ক্ষেত্রে লেখকের মুসলমান ধর্ম বিদ্বেষের মনোভাব ফুটে ওঠেনি। বরং সেখানে এসেছে শ্রদ্ধাশীল মনোভাব - অত্যাচারিত মানুষের মর্মবেদনা, জাতপাতের সমস্যাদীর্ণ মানুষগুলির আর্তিই গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সৃষ্টি হয়েছে পাঠকমনে এর নিরসনের আবেদন। 'মহেশ' গল্পটি বিশ্বসাহিত্যের একটা সেরা সৃষ্টি। 'গফুর' চরিত্র সৃষ্টি করে শরৎচন্দ্র এক নিঃস্ব মুসলমান পরিবারের উপর শোষণের চিত্রকে অনুপম শৈলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'গফুর' মুসলমান সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ কিনা তা ভাববার কোন সুযোগই থাকেনা পাঠকের মনের কাছে। সবকিছু হারিয়েও 'গফুর' মানবিক গুণাবলীর সম্পদে ভরপুর চরিত্র। "ও দুটো খেতে চায়"- তর্করত্নের কাছে গফুরের এই আর্তি নিঃস্ব, রিক্ত, শোষিত, নির্যাতিত এক বাঙালীর মর্মবেদনা। 'আমিনা' 'গফুরে'র মেয়ে। শরৎচন্দ্র বলছেন, "বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে জল ঢালিয়া দেয় সেই টুকুই সে ঘরে আনে।"

কী আবেদন সৃষ্টি করে পাঠক মনে? হিন্দুত্বের? সাম্প্রদায়িকতার? নাকি জমিদারী শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের? তাছাড়া, গো-হত্যা আছে বলে ম্যাট্রিকের সিলেবাস থেকে এই গল্পকে বাদ দেওয়া অথবা এই ধরনের গল্পের ফলে 'জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে' বলে হিন্দু জমিদারের অভিযোগই বা কী ইঙ্গিত বহন করে। সেখানে লেখকের হিন্দুত্বের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব কি আদৌ প্রতিফলিত হয়েছে? বরং হিন্দু গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদারের মুসলমান প্রজার উপর নির্যাতনের মর্মন্তুদ কাহিনী পড়ে এবং সবশেষে গফুরের আল্লার দরবারে মর্মস্পর্শী প্রার্থনা শুনে পাঠক সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে চায় তার আঁখিও জলে টলমল করতে থাকে।

অতি অল্প কথায়, 'পল্লীসমাজে' শরৎচন্দ্র জমিদার-মহাজনদের চরিত্র উদঘাটন করে বলেছেন, "মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে কোন কৃষক ...ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ মহাজনেরা প্রায় হিন্দু।"

এই 'পল্লীসমাজে' আকবর চরিত্রটি - উচ্চ না নীচ স্তরের মুসলমান সমাজের মানুষ, তা নিয়ে ব্যাকরণগত আলোচনা হয়ত কেউ করবেন বা এই চরিত্রটিকে খুবই নগণ্য বলে কেউ কেউ তাকে আখ্যায়িত করবেন। কিন্তু স্বল্প পরিসরে এই চরিত্রটি একটি মানবিক মূল্যবোধের নজির। রমা কেবলমাত্র রমেশকে জব্দ করতেই আকবরকে বাঁধ পাহারার কাজে নিযুক্ত করেছিল। পরাজয়ের পরও এসে সে যখন রমেশকে তাদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিবরণ দিচ্ছিল, তখন তার মধ্যে ধর্মীয় প্রশ্ন কারুরই মনে আসে না। পরে বেণী ঘোষাল যখন তাকে বেইমান বলে গালাগালি করেছে, তখন সেই নীচতার বিরুদ্ধে আকবরের প্রতিবাদকে কী নিখুঁতভাবে শরৎচন্দ্র মাত্র একটি কথায় তুলে ধরেছেন- "খবরদার বড়বাবু, মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি ও পারি না।" এমন কী, আকবর শাস্তি ভোগ করতে রাজী, তবু মিথ্যা বলতে তাকে রাজী করানো যায়নি সে বলছে, "দিদি ঠাকরুণ তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল

খাটতে পারি, ফৈরিদি হব কোন কালামুয়ে?” সহজ, সরল, সত্যবাদী এক ‘আকবর’ পাঠকের মনে যে আবেদন সৃষ্টি করে তার মূল্য কি খুব কম?

বাস্তবে ‘পল্লীসমাজ’-এ দরিদ্র মুসলমান প্রজাদের অনেকখানি, কুসংস্কার বিরোধী ও উদার হিসাবেই শরৎচন্দ্র অঙ্কন করেছেন। রমেশ যে কারণে এই মুসলমান প্রজাদের মধ্যেই অনেক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরী রমেশকে বলেছেন, “... মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই।... তুই বলবি, মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞানতা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু তাদের সজীব ধর্মই তাদের সব দিক শুধরে রেখেছে।” এই সজীব ধর্মের উদাহরণ দিয়ে বিশ্বেশ্বরী আরও বলেছেন, “পীরপুরে খবর নিলে শুনতে পাবি, জাফর বলে একটা বড়লোককে তারা সবাই একঘরে করে রেখেছে, সে তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না বলে; কিন্তু আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সেদিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা করে দিলে, কিন্তু সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে।”

আর এক অসাধারণ চরিত্র ‘দেনাপাওনা’ উপন্যাসের ফকির সাহেব। ষোড়শীর প্রতি তাঁর প্রীতি ও স্নেহ পরস্পরের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে ফকির সাহেবের কথোপকথন থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও ব্যারিষ্টার সাহেব মানুষকে যথার্থ মর্যাদা দিতে শেখেননি। গ্রামের প্রধান জনার্দন রায় বলছেন, “আপনি মুসলমান, বিদেশী, আপনার ত হিন্দু ধর্মের মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থ হবার দরকার নেই।” সংসার ত্যাগী ফকির সাহেব বৃহত্তর সংসারে জড়িয়ে একদিন শিশু ষোড়শীকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি তাই বললেন যে, ‘এ বুড়ো একটা ভুল করেছিল। অনেকদিন আগে এই মন্দিরের কাছে যে নিমগাছতলা ছিল সেখানে আমি বসতাম এবং ষোড়শী তখন এতটুকু মেয়ে, তখন থেকেই মা বলে ডাকি-মুসলমান হয়েও যে ভুলটা ক’রে ফেলেছি সেটা আজ আপনাকে মাপ করতে হবে। সেই মায়ের এতবড় বিপদে কি না আসতে পারি? মা জিনিসটা তো তুচ্ছ নয়?’ এক হিন্দু সন্ন্যাসিনী-যার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজপতিরাই চক্রান্ত করছে- তার পিতৃত্বের আসনে ফকির সাহেব প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজেকে। শুধু তাই নয়, নানান কথাবার্তার সময় তিনি এমনও বললেন, “এখানে মাতঙ্গিনী ভৈরবীর কথাটা তুলতে পারতুম, কিন্তু একজনের ভাল করার জন্যেও অন্যের গ্লানি করা আমাদের ধর্মে নিষেধ।” -এর মধ্যে ইসলাম বিদ্বেষ কি বিন্দুমাত্রও প্রতিফলিত হয়েছে? বরং মূল্যবোধের প্রকাশে আনন্দে, গর্বে একটা সম্প্রীতির আর্দ্ররসে অনুভূতি প্রবণ পাঠকের চোখের কোণে জল আসে। সে চোখের জল বেদনার্ত হৃদয়ের নয়, আনন্দ অনুভূতির উদগত অশ্রু। যে শিল্পী এই সম্প্রীতি ও সৌন্দর্যের এমন আর্দ্ররসের স্রষ্টা তার মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, অপর ধর্ম সম্পর্কে বিরাগ-বিদ্বেষের অভিব্যক্তি যে নেই একথা নতুন করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বাহুল্যমাত্র।

একথা সর্বজনবিদিত যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের গলিত শবদেহকে ‘জীবন্ত’ বলে সনাতন ঐতিহ্যবাদীদের মধ্যে একদল প্রচার করলেও তা যে একটি মিথ্যা প্রহসন - শরৎচন্দ্র একথাকে তুলে ধরেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্য ও জীবন সাধনায়। তাই সমাজ পরিত্যক্তা, লাঞ্ছিতা, পীড়িতা নারীর জীবন-জিজ্ঞাসাকে তিনি উপস্থিত করেছেন পাঠকের দরবারে। অভয়ার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীকান্তকে ভাবতে হয়, থমকে যেতে হয়। অভয়ার সুস্পষ্ট জিজ্ঞাসা- “আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সংকটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে করে নিতে হবে পরের কাছে?” এই আপন-পরের নিশানা দিয়ে অভয়া অভয়েই শ্রীকান্তকে বলেছে, “আপনারা জায়গা নাই দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে। ...আমরা ত এখানে অল্পদিন এসেছি, কিন্তু এর মধ্যেই দেখেছি মুসলমানেতে এই দেশটা ছেয়ে গিয়েছে।” হিন্দু ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে অভয়ার আরও স্পষ্ট বক্তব্য শরৎ চিন্তারই প্রতিফলন। অভয়া শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করেছে,“...তাহলে কি তারা (মুসলমান সম্প্রদায়) অন্যায়টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠেছে, আর আপনারা (হিন্দুরা) ন্যায়ধর্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে?... আজ সকালেই জাহাজ

ঘাটে যে অন্যায় (বিবাহিতা বর্মা স্ত্রীকে মিথ্যায় ভুলিয়ে সর্বস্ব নিয়ে ফেলে রেখে দাদার সাথে চলে যাওয়ার সময়ের নিষ্ঠুর অভিনয়) দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন তো, কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার করে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হতো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করে অগ্রজের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোনটাতে সত্যকার ধর্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু।"

'শ্রীকান্তে'র গহর আর একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। উদাসীন, কবিত্বে পরিপূর্ণ মন, ধনদৌলতের প্রতি কোন আসক্তিই তার নেই, গহরের বাড়ীতে কর্মরত নবীনকে দেখে যখন শ্রীকান্ত 'মিঞা' নামে সম্বোধন করেছে, গহর বলেছে, ক্ষ্মও মিঞা নয়, ও আমাদের নবীন, আমাদের কোথায় কি আছে সব জানে।ক্ষ্ম অন্যদিকে কমললতা গহরকে প্রশ্ন করেছে, "এ কেমন ধারা বামুন বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না।" গহরের উত্তর- "সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।" সেই গহরকে কেন্দ্র করে শ্রীকান্ত, নবীন, কমললতা চরিত্রগুলির ঘটনা বিন্যাস ও পারস্পরিক আদান-প্রদান বিশেষ কোন ধর্মের মধ্যে না থেকে বৃহত্তর মানুষের সমাজের বৃহত্তর প্রবাহে গিয়ে মিশেছে। আশ্রম থেকে কমললতার প্রস্থান আর গহরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে বেদনা বিধুর পরিসমাপ্তি তা পাঠক মনকে করুণ রসে জারিত করে তোলে। বাস্তবে স্বল্প পরিসরে গহর চরিত্র হীরার দ্যুতির মতই এক অনন্য-সাধারণ মহত্বের প্রতীক হয়ে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের মনের দুয়ারে। সত্যিই এক অনবদ্য সৃষ্টি।

গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলি ছাড়াও শরৎচন্দ্রের ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা পাই তাঁর 'নারীর মূল্য' রচনায়। একদিকে সেখানে তিনি বলেছেন, "যে ধর্ম বনিয়াদ গড়িয়াছে, আদিম জননী ইভ-এর পাপের উপর, যে ধর্ম সংসারের সমস্ত অধঃপতনের মূলে নারীকে বসাইয়া দিয়াছে, সে ধর্ম সত্য বলিয়া যে কেহ অন্তরের মধ্যে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহার সাধ্য নয় নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।" তিনি এও দেখিয়েছেন নারীর স্থান অবনত করিবার জন্য ধর্মব্যবসায়ীদের স্পর্ধা বহুদুর বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, "ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় একমাত্র ইসলাম ধর্মে। যদিও নারীর স্থানটি কোরাণের মতে ঠিক কোনখানে, তাহা বুঝাইয়া বলা অতি কঠিন, তথাপি মহম্মদ নারীজাতিকে যে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, পুত্র-কন্যার মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তুলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বিধবাকে যাহার অবস্থা আরব ও ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে শোচনীয় ও নিরুপায় ছিল- তাহাকে দয়া ও ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখিতে হুকুম করিয়া গিয়াছেন, এসব কথা অস্বীকার করা যায় না।ক্ষ্ম এই সমস্ত কারণেই কিছু সমালোচক ছাড়া বহু মানুষ, এমনকি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও শরৎচন্দ্রকে বলতেন, ক্ষ্মআপনার মুসলমান প্রীতি অতি প্রসিদ্ধ।"

বিরাগ বা বিদ্বেষ নয়- প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতি মুসলমান সমাজের ছিল অভিমান

আশ্চর্যের বিষয় হল, 'বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা' নিবন্ধে শরৎচন্দ্র তাঁর মূল চিন্তাধারার ব্যতিক্রমী মন্তব্য করে মুসলমান সম্প্রদায়ের যত বিরাগভাজন বলে প্রচার হয়েছে, বাস্তবে তা কিন্তু ঘটেনি। আসলে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিয়ে মুসলমান সমাজে ছিল এক অদ্ভুত অভিমান। সেটা বিরাগ বা বিদ্বেষ নয়। কারণ সমগ্র বাংলায় যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে উত্তাল জনমানস- সেই ১৯৩৬ সালেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দশম বার্ষিক অধিবেশনে তাঁকে সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের পরিচালক মণ্ডলী। শুধু তাই নয়, আরও উল্লেখযোগ্য হল, তিনিই সম্ভবতঃ একমাত্র অমুসলিম সাহিত্যিক যিনি এভাবে সভাপতির পদ অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিদ্বেষ থাকলে তা ঘটত না। একথা সত্য শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে মুসলমান সমাজ তার সমস্যা, অগ্রগতি প্রভৃতি নিয়ে উপযুক্ত সাহিত্য আশা করেছিল। মুসলমান সমাজের বহু বিদগ্ধ মানুষের কথার মধ্য দিয়ে সে আকাঙক্ষা পরিস্ফুট হয়েছিল। এই প্রাপ্তি ঘটেনি বলেই ছিল তীব্র অভিমান এবং তা ছিল নিবিড় সম্পর্কের ফলেই। শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর এই সীমাবদ্ধতাকে

স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ''...সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান চরিত্র এঁকেছেন, কটা জায়গায় এতবড় বিরাট সমাজের (মুসলমান সমাজ) সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন।... কেমন করে তাদের সহানুভূতি পাবেন। কিসে তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে। স্পর্শ করেনি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।''[৩৪] শরৎচন্দ্রের এই কথা শুনে তাঁরই এক নবীন মুসলমান বন্ধু (কাজী মোতাহার সাহেব) দুঃখ করে বলেছিলেন, ''হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎজাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মত বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে ভাবলেও বিস্ময় লাগে।''[৩৫] তিনি শরৎচন্দ্রকে আবেদন করেছিলেন 'স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে কাছে টেনে নিতে।' বলেছিলেন, ''হিন্দুর জন্যই হিন্দু সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন।''[৩৬]

এই প্রয়োজনের কথা শরৎচন্দ্র নিজে স্বীকার করতেন। হিন্দুতে-মুসলমানে এই যে অবাঞ্ছিত ব্যবধান, তার জন্য বেদনা অনুভব করতেন তিনি। মনে প্রাণে চাইতেন এই ব্যবধান যেন একদিন ঘোচে। তিনি বলতেন, ''সাহিত্য সাধনা যদি সত্য হয়, সেই সত্যের মধ্য দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ সাহিত্য সেবকরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খৃষ্টান হোক, তবু পর নয়-আপনার জন।''[৩৭] তাঁর স্থির বিশ্বাসই হল -''মানুষ যখন সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট চিত্ত, তখন সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়।''[৩৮] লীলাময় রায় ছদ্মনামে অন্নদাশংকর রায় এক সময় বলেছিলেন, ''হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয়না, তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙালী হয় না, ভারতীয় হয় না।''[৩৯] তার প্রতিবাদ করে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে, 'নিশ্চয়ই হবে এবং আমি তার জন্য অপেক্ষা করে আছি।' এবং বলেছেন, 'সাহিত্যের দ্বারাই তা সম্ভব।'

কিন্তু মুসলমান সমাজের সমস্যা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের অবতারণা করে কাজী মোতাহার সাহেবকে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, ''অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভাল কথার সঙ্গে মন্দ কথাও-যে গল্প সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ।''[৪০] আর সেক্ষেত্রে রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে যে ধরণের বিরোধিতা আসতে পারে তার পরিণাম নিয়ে শরৎচন্দ্র আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

এই আশঙ্কার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে কিন্তু শরৎচন্দ্রের বাধেনি। সরাসরিই তিনি বলেছিলেন। তাতে অভিমান যখন আরও তীব্র হয়েছে তখন তিনি তার প্রতিকারের পথও দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''যাঁরা প্রাচীনপন্থী, যারা পিছনে ছাড়া সুমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ কি মুসলিম কি হিন্দু সকল সমাজেরই বিঘ্ন স্বরূপ। হিন্দুদের সম্বন্ধে এ কথা আমি বহুবার বহুস্থানে লিখেছি, মুসলিম সমাজের সম্বন্ধেও অসংশয়ে বলতে পারি, এ জাগরণ হয় যদি নবীনের- আসুক সে শ্রাবণের পূর্ণিমা জোয়ারের মত সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে, তবু তাকে আমি দুহাত তুলে সম্বর্ধনা করে নেব। জানবো, এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ এবং সুন্দর, এদের হাতে হিন্দু-মুসলিম কারও ভয় নেই এদের হাতে আমরা দুজনেই হব নিরাপদ। আমার আশঙ্কা শুধু প্রাচীনপন্থীদের সম্বন্ধে।''[৪১] শিক্ষিত মুসলমান সমাজ খোলাখুলি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় যুক্ত হয়েছিল সেদিন। কাদের নওয়াজ অভিমানের সঙ্গেই বলেছিলেন, ''সুখ ও দুঃখ, আলো ও আঁধার, অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, পুরস্কার ও তিরস্কার সংসারে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এসব নিয়েই যখন সাহিত্য সৃষ্টি তখন কথা সাহিত্যেই বা তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন? মুসলিম সমাজ কি চান যে, কথা সাহিত্যে থাকবে কেবল তাদের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ?''[৪২] এই অভিমানের সঙ্গে তিনি শরৎচন্দ্রের আশঙ্কার সত্যতার স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, ''হিন্দু সমাজ শিক্ষিত, উদার ও ক্ষমাশীল, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু একথাও সত্য যে, প্রকৃত মুসলিম দীন হলেও হীন নয়, বাসা তার ভাঙা হলেও আশা তার উচ্চ এবং সে ভক্ত ও শক্ত। অবশ্য মুসলমান সমাজের অনেকে শিক্ষা-দীক্ষাহীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের কথাই হয়তো শরৎবাবু ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর অজ্ঞের দল সব সমাজেই কম বেশী কি নেই? সেইসব ভাবপ্রবণ অজ্ঞদের কার্যকলাপ

কোনও সমাজই সমর্থন করেন না, বরং তীব্র নিন্দাই করে থাকেন। এইসব ঘৃণিত ব্যাপারের পরিসমাপ্তি সেই দিনই হবে যেদিন দেশে শিক্ষার আশাতীত উন্নতি হবে।"[৪৩]

শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে গভীর আকাঙক্ষা ও প্রত্যাশা ছিল বলেই এই খোলামেলা আলোচনা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। অকপট এই আলোচনার মধ্যে সহৃদয়তার যে চিত্রটি ফুটে ওঠে, তাকে উপলব্ধি করতে না পারাটা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্যজনক। কত আশা নিয়েই না শরৎচন্দ্র সম্পর্কে মীনাজুর রহমান সেদিন বলেছিলেন - "মুসলমান সমাজে তাঁর উপন্যাসের কম সমাদর হয়নি। হিন্দু সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছা প্রণোদিত এমন ধারা নির্মম কশাঘাতও মুসলিম সমাজ অম্লান বদনে গ্রহণ করবে, তা জোর করে বলতে পারি। বাংলা কথাসাহিত্য সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।"[৪৪] প্রশ্ন জাগে, আর কোন সাহিত্যিককে এমন অনুরোধ কি সেদিন করেছিল মুসলমান সমাজ?

শুধু অনুরোধই নয় স্পষ্ট ভাষায় মুসলমান সমাজ সেদিন বলেছেন, ক্ষ্ম...রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের লেখা পড়ে তাঁদের জাতি ধর্মের কথা কারো মনেই আসে না। মহাপুরুষের ধর্ম 'মানবতা'। সাম্প্রদায়িকতা সেখানে কপূরের মতই উবে গেছে। তাঁদের পেয়ে হিন্দু-মুসলিম সমভাবেই গৌরবান্বিত, তাতে সন্দেহই থাকতে পারে না। কবিগুরুর 'তাজমহল' কবিতা পড়ে আমরা সগৌরবে বলি, 'It is a greater Tajmahal than that of Shahjahan.' হিন্দু সাহিত্য মুসলিম সাহিত্য বলে বিভিন্ন সাহিত্য আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। সাহিত্যের স্বরূপ এক, সে চিরন্তন ও সার্বজনীন। তবে তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে গেলে হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্যিকের সহানুভূতি, সহযোগ ও সম্প্রীতির একান্ত দরকার। আমার মনে হয় সাহিত্যের এই 'পূর্ণিমা মিলন' সাহিত্য গগনের 'শরৎচন্দ্রে'র দ্বারাই সম্ভব। তিনি যে মুসলিম সাহিত্যিকদের দোষ ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টায় 'অবাঞ্ছিত ব্যবধানে' নিজের মত ব্যক্ত করেছেন এটা আশা ও আনন্দের কথা।"[৪৫]

এই আশা ও আনন্দের সূত্র ধরে আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়ে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শুধু ডি.লিট উপাধি দান করেছিলেন তাই নয়, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানকার বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক সমাজ শরৎচন্দ্রকেই বিগত কালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকের মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। বহুকাল আগত ঐতিহাসিক ধারায় উদ্ভূত বাঙালী জাতির বিশিষ্ট উত্তরাধিকার তাঁরা শরৎসাহিত্যের মধ্যেই দেখতে পেয়েছেন। তাঁদের কাছে শরৎচন্দ্র একান্তভাবেই বাঙালী লেখক, হিন্দু লেখক নন।[৪৫ক] তবে এটা দুর্ভাগ্যের যে, সে 'আনন্দ' অনুভূত হয়নি এদেশের একদল তথাকথিত মার্কসবাদী ও প্রগতিবাদীদের!

মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট ও সিদ্ধান্ত

জীবনের প্রান্তবেলাতেই শরৎচন্দ্র মুসলিম সমাজ নিয়ে সাহিত্য সাধনার বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন। বিশেষ করে যখন তিনি ঢাকায় ডি.লিট উপাধি গ্রহণের জন্য ছিলেন। সেই সময়েই এই প্রশ্নটি তাঁর মধ্যে স্পষ্টভাবে জাগ্রত হয়। সময়কাল ছিল ১৯৩৬ সাল। বাংলাদেশে তখন 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'কে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র ঢেউ বিদ্যমান। এই সময়েই ঢাকায় থাকা কালে মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন বলে শরৎচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি অবিনাশ ঘোষালকে বলেছেন, "উপাধি বিতরণের পর একত্র আহারের সময় লাট সাহেব পরামর্শ দিয়েছেন, হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য দূর করার জন্য শরৎচন্দ্রের উচিত মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনা করা।"[৪৬] সাম্প্রদায়িকতার কারণে উত্তপ্ত কলকাতার একটি মহল শরৎচন্দ্রের এই প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করেছিলেন এবং তা করেছিলেন নিজেদের অত্যন্ত নিম্নরুচির পরিচয় দিয়ে। সে সময় 'শনিবারের চিঠি' লিখেছিল, "ঢাকায় মুসলমানী সাহিত্য রচনার প্রতিশ্রুতি দিবার পর হইতে আমাদের ডঃ শরৎচন্দ্রের দিন বড় খারাপ যাইতেছে। অথবা এমন হইতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি তাঁহার সহিতেছে না। শরীর ভাল নয়, আষাঢ়ের ভারতবর্ষে তাহার প্রমাণ পাইলাম, লেখাও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।"[৪৭] শুধু তাই নয়, ব্যঙ্গ করে একদল এমনও বলেছিলেন, "বহুবাঞ্ছিত ডি. লিট

যখন নভেল লিখেই পাওয়া গেল এবং তা যখন রহমন সাহেবের (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) হাত দিয়েই এলো, তখন এই ব্রাহ্মণবটু আতিশয্যে বলে ফেললেন, 'তিনি অতঃপর মুসলমান ভাইদের নিয়েই নভেল চালাবেন।'... হায় শরৎচন্দ্র, তোমার এই প্রাণের দায়ে কাঙালপনা দেখিয়া সত্যই তোমাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা হয়।"[৪৮] প্রসঙ্গত এও উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস অবশ্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর 'আত্মস্মৃতি'-তে বলেছেন- "প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি, তাঁহার মৃত্যুর পর একাধিকবার।" তবে বলা বাহুল্য এই ব্যঙ্গ বা কটূক্তিই সব ছিল না, রসচক্রের সভ্যরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন- সেখানে শরৎচন্দ্রও উপস্থিত ছিলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, আমরা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে জানতে পারি, মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনা শরৎচন্দ্রের আকস্মিক কিংবা উপাধি প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস প্রসূত সিদ্ধান্ত ছিল না। তিনি বলেছেন, "অনেক পূর্ব হইতে তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) মনে একটা ইচ্ছা বর্তমান ছিল। সে বলিত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুসলমানদের যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাতে আমার মন সব জায়গায় সায় দেয় না। কৃষ্ণকান্তের উইলে দানেশ খাঁ যখন নিশাকরের কথা শুনতে শুনতে এক বাত হুয়া দো বাত হুয়া বলছিল, তখন নিশাকর উত্তর দিয়েছিল ওস্তাদজি, শুয়োর গুনছো নাকি?- এই রকম সব উক্তির দ্বারা অনর্থক তিনি মুসলমান সমাজের দোষত্রুটি না দেখাইয়া উপন্যাস রচনা করিলে মুসলমানেরা ব্যথিত হইত না হয়ত। এই জন্য সে (শরৎচন্দ্র) মুসলমান সমাজ ও জীবনকে লইয়া একখানি উপন্যাস লিখিবার সংকল্প করিয়াছিল।"[৪৯]

কাজী আবদুল ওদুদ, মোতাহার হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের যখন তিনি মুসলমান সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনার প্রতিশ্রুতি দেন তখন আর একটি কারণও শরৎচন্দ্র সেক্ষেত্রে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বাংলার জনগণের একাংশ হিসাবে হিন্দু সমাজের কথা যখন সাহিত্যের প্রধানাংশে লিখেছেন, তখন অপর অংশ নলমান সমাজের কথা লেখার দায়িত্ব তাঁর আছে। যদিও বিষয়ে বিনয়ের সঙ্গেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাবকেও স্বীকার করেছেন। যে কোন বস্তুবাদী সাহিত্যিকই মনে করেন যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকে, দের নিয়ে সাহিত্য তাদের সাথে নাড়ীর সংযোগ না থাকে, তাহলে যথার্থ সাহিত্য গড়ে ওঠে না। তাই শরৎচন্দ্র ঢাকায় অবস্থান কালে বলেছিলেন যে, 'আমি যে জিনিস বাস্তবে নিজে দেখিনি তা নিয়ে কখনও লিখিনা। বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া যেমন তেমন করে আমি লিখিনা। মুসলমান সমাজকে ভেতরে ঢুকে দেখার সুযোগ আমার হয়নি।' তাই যখন তিনি মুসলমান সমাজকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করার কথা ভেবেছিলেন, তখন একজন বাস্তববাদী সাহিত্যিক হিসাবে ঢাকার বিশিষ্ট মুসলমানদের সঙ্গে "মুসলমান সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ব্যাপার লইয়া (তাহাদের সঙ্গে) আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।" শরৎচন্দ্র সাগ্রহে তাঁদের তখন বলেছিলেন, "একবার তোমাদের (মুসলমানদের) জীবনযাত্রা প্রণালী ভালো করে দেখাতে পারো?"[৫০] ফলে একথা সত্য যে, মুসলিম সাহিত্য রচনা কোনভাবেই তাঁর হঠাৎ প্রতিশ্রুতি ছিল না। লাটসাহেবের মুসলিম সাহিত্য রচনার আবেদন প্রসঙ্গে অবিনাশ ঘোষালকে তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন, "আমি তাঁর কথায় সম্মতি জানাই। ভেবে দেখলুম, তিনি কিছু অন্যায় বলেননি। বাস্তবিকই আমরা এতই মুসলমান সম্প্রদায়কে আমাদের বিরুদ্ধবাদী বলে মনে করি না কেন, আসলে ওরা আমাদের দেশেরই-এখানেই ওদের সব। আমাদের যা মাতৃভাষা, ওদের মাতৃভাষাও তাই। সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়ে যদি তাদের কথা লিখি, তারা তা শুনবেই- না শুনে পারে না।"

এই বিষয়ে তাঁর আন্তরিকতার আরও নিদর্শন মেলে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়। তিনি বলেছেন, ক্ষ্মএই উপন্যাস (মুসলিম সমাজ নিয়ে) লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত শরৎচন্দ্র অনুরোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে সে প্রস্তাব খারিজ করে (শরৎচন্দ্রকে) বলেন, "...সামাজিক জীবন সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা খুব গভীর, তুমিই এ বিষয়ের যোগ্যতম ব্যক্তি।"[৫২] বড় মানুষ ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মূল্য বুঝেছিলেন এবং মূল্য দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "শরৎ তুমি আমাদের বঙ্গ সমাজকে দেখেছ অন্দরমহলে ঢুকে। আমি দেখেছি বাইরে থেকে উঁকি মেরে। না, সত্যিই তাই। কারণ আমরা যে ছিলাম একঘরে। তুমি বঙ্গ সমাজের

অনেক কিছু দেখেছ যার নাগাল আমি পাইনি।"[৫৩] শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই আস্থা যথার্থই কত গভীর ছিল তার আরও পরিচয় আমরা পাই বাংলা ১৩৩৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি আয়োজিত শরৎ সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "তাঁর (শরৎচন্দ্রের) গল্পে যে রসকে তিনি নিবিড় করে যুগিয়েছেন, সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্বের চেয়ে পাঠকের আরও অনেক কাছে এসে পৌঁছাল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, স্পষ্ট করে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর করে।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন, "আধুনিক লেখকরা শরৎচন্দ্রের পথেরই অনুসারী।" লিখেছিলেন, "একদিন তারা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না।"[৫৪] একথা সত্য, তথাকথিত আধুনিক লেখকদের কেউ কেউ সত্যিসত্যিই শরৎচন্দ্রকে ভুলতে চাইছে, স্বীকার করতে চাইছে না, কিন্তু পাঠকেরা ভোলেননি। আজও তাই শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের আস্থা, মুসলমান সমাজের আবেদন, সেই সাহিত্য রচনার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করে ঢাকায় তিনি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছেন, "চারু জ্বরের ঘোরে আজ দুপুরে ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছিলাম যে, (আসন্ন) উপন্যাসখানি কীভাবে আরম্ভ করে কীভাবে সেটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাব। আজ সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখন আমার মধ্যে একটা পরিষ্কার প্লট আমি গড়ে তুলেছি তার আরম্ভ থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত।"[৫৫] কিন্তু বাংলা সাহিত্য সে উপন্যাস পেতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের সে আশা এবং প্রতিশ্রুতিও আর পুরিত হতে পারেনি। আমরাও বঞ্চিত হয়েছি সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সাহিত্য থেকে। ঢাকা থেকে ফেরার পরই তিনি ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একবছরের মধ্যেই প্রয়াত হন। মুসলমান সমাজ ও মুসলিম সাহিত্য সম্পর্কে এই যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভূমিকা তার সামগ্রিক মূল্যায়ন না করে, দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন সেই সময়কার বিচ্ছিন্ন কিছু মন্তব্যকে ভিত্তি করেই শরৎচন্দ্রকে 'সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন' বলে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস যে কতখানি অযৌক্তিক, বিভ্রান্তি মূলক এবং বোধ করি উদ্দেশ্য প্রণোদিত তা সুস্থবোধ সম্পন্ন মানুষের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

যুগের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধিতে যুগোপযোগী
মূল্যায়ন ও শিক্ষাগ্রহণই আমাদের করণীয় কর্তব্য

তবে এ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন আলোচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাহল, শরৎচন্দ্র এদেশের নবজাগরণের আপসহীন বলিষ্ঠ মানবতাবাদী ধ্যান-ধারণার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে মন্তব্যগুলি একটা সময়ে করেছেন, তারই বা কারণ কী? এক্ষেত্রে তাঁর যুগের বা নিজের সীমাবদ্ধতা কোথায় এবং কতখানি ছিল, তা যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে না পারলে আমরা সত্যে উপনীত হ'তে পারব না।

শরৎচন্দ্র ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মানবতাবাদী। তাঁর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী মূল্যবোধেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে বলিষ্ঠভাবে। আবার তিনি যেহেতু মানুষের সাথে মিলেমিশে তাঁর সাহিত্য সাধনা করে গিয়েছেন সেহেতু কিছু জিনিস প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মধ্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও কতকগুলি ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দেখেছেন হিন্দুদের একাংশকে স্বাধীনতার দাবীতে উদ্বেল হতে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশীরভাগের মধ্যে সেই দেশপ্রেমের হদিশ তিনি পাননি - কিছু ব্যতিক্রমী শিক্ষিত মুসলমান ছাড়া। যার জন্য তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক হিন্দুই মনে প্রাণে ন্যাশনালিস্ট। তাদের বেদ তাদের উপনিষদ বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল।"[৫৬] আবার এও প্রত্যক্ষ করেছেন যে, "অধিকাংশ ধনী মুসলমানই নায়েব গোমস্তা উকিল ডাক্তার হিসাবে স্বজাতির চেয়ে হিন্দুদের বিশ্বাস করেন বেশী।"[৫৭] হিন্দুদের মধ্যে দেশপ্রেমের এই অবস্থান দেখে তিনি এমনও মন্তব্য করেছেন "হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ।" মনে করেছেন, এর শৃঙ্খল মুক্তির দায়-দায়িত্ব শুধু হিন্দুরই। তিনি দেখেছেন, "মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে - এদেশে তাহার চিত্ত নাই।"[৫৮] নিজেই শরৎচন্দ্র এমন সিদ্ধান্তও টেনেছেন "ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এসত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না।" এই

ধরণের অস্পষ্ট চিন্তার অভিব্যক্তি সত্ত্বেও তিনি সঠিক ভাবে একথা বলেছিলেন, একমাত্র ধর্মের মোহ থেকে সকল মানবের মুক্তির মধ্যেই ভারতবাসীর মুক্তি সম্ভব। কিন্তু এই সব সমস্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলেও মুসলমান সমাজের মধ্যে কেন এই মনোভাব তা সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা তাঁর পক্ষে সেদিন সম্ভবপর হয়নি। তাঁর পক্ষে এও বোঝা সম্ভব হয়নি যে, ইসলাম ইতিহাসের সর্বশেষ ধর্ম হওয়ায় অন্য ধর্মের তুলনায় উদার ছিল। তাই মুসলমান ধর্মসংস্কারকরা সংস্কার প্রচেষ্টায় কোরাণকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। হিন্দুধর্মে যেমন বেদান্তকে সংস্কার করার পথেই নবজাগরণের সূচনা-এক্ষেত্রে তা হয়নি। ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মুসলমান সমাজের আপাত অন্ধতা দেখে তাঁর যে বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিরক্তি জনিত কারণে তাঁর মধ্যে বিভ্রান্তি সাময়িকভাবে এবং সীমিত ক্ষেত্রে হলেও ঘটেছে। এক্ষেত্রে একটা কথা একই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ধর্মনিঃস্পৃহ মানবতাবাদীরা মহৎ চরিত্রের অধিকারী হলেও তাঁদের যুগের এবং দর্শনের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার জন্য এবং তার নিয়মকে সমাজবিকাশের ধারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীদের মত উপলব্ধি না করতে পারার ফলে তাঁরা কখনও কখনও অভিজ্ঞতাবাদী বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন একথাই বলেছে যে, কোন ঘটনা থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তি ধারণাই সত্য নয়- বিদ্যমান ঘটনা বা ঘটনাপ্রবাহ থেকে সত্যকে আহরণ করতে হয়। ঘটনার অন্তর্নিহিত নিয়মকে উপলব্ধি করে সত্যকে আহরণ করার বিজ্ঞানসম্মত পথ গ্রহণ না করলে আমরা এই ধরনের অভিজ্ঞতাবাদী বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাই। তাছাড়া এও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, একজন ধর্মনিঃস্পৃহ মানবতাবাদী, অজ্ঞেয়বাদী এবং একজনৰূঢ়দ্বন্দ্ব এর মধ্যে পার্থক্য থাকে। এটি অনুধাবন না করলে আমাদের বিচার যথাযথ হবে না। যেমন, শেকসপীয়র থেকে শুরু করে আইনস্টাইন পর্যন্ত যে কোন মানবতাবাদী মহৎ মানুষের বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা, ভাষণ বা জীবনের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা দিয়েই যদি তাঁদের সামগ্রিক মূল্যায়ন করি, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সুবিচার করব না। সেক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ ভূমিকার প্রতি আমাদের উপযুক্ত শ্রদ্ধাও প্রদর্শিত হবে না। অথচ অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টি বিচারের মধ্যে আনতে বিস্মৃত হই। ফলে সামগ্রিক বিচারের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচিত বিষয়টির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা যা ছিল, তা ছিল সেই যুগের এবং একটি বিশেষ দর্শনের সীমাবদ্ধতা।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখানো হয়েছে যে, আমাদের দেশের নবজাগরণের বিকাশ এবং বিস্তৃতি ঘটেছে এমন একটা সময়ে, যখন বিশ্বে মানবতাবাদ তার যৌবনের যুগকে অতিক্রম করে বার্ধক্যে পঙ্গু। এই কারণে আমরা আমাদের দেশের নবজাগরণের মধ্যে আমরা পাই সুস্পষ্ট দুটি ধারা। একটি ছিল যৌবনোদ্দীপ্ত আপসহীন, সেক্যুলার, অজ্ঞেয়বাদী- শেকসপীয়রের সময়ের বা রেনেসাঁসের মানবতাবাদী বিপ্লবাত্মক সুরে বাঁধা। আর একটি ছিল অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে মানবতাবাদী মূল্যবোধের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা আপসমুখী ধারা। এ বিশ্লেষণ মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষের। তিনি বলেছেন, ‘‘রাজনৈতিক আন্দোলনেও তাই আমরা গণতন্ত্রের ভাবনা ধারণার সঙ্গে ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলির একটা আপস করে নিয়েছি। ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিনি। ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে আমরা জাতীয়তা ও জাতীয়তাবোধের নূতন ভাবধারাগুলিকে সামনে নিয়ে আসতে পারলাম না। ফলে জাতীয়তাবাদ মূলতঃ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হয়ে পড়ল এবং এরূপ অবস্থায় অতি স্বাভাবিক ভাবেই এই আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য থেকে গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন, গণতান্ত্রিক ভাবনা-ধারণার কথা যত সুন্দর করেই তাঁরা বলুননা কেন, এই কারণেই ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে তা স্পর্শ করতে পারল না। বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্ব যাঁরা ছিলেন... তাঁরা অনেকেই বহু।

প্রভাবশালী মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনে টেনেছিলেন।... কিন্তু গোটা মুসলমান সমাজকে আমরা নাড়া দিতে পারলাম না। তাদের সংশয় আমরা দূর করতে পারলাম না। শুধু কি তাই? আমরা হিন্দু সমাজের জাতপাতকেও দূর করতে পারলাম না, ফলে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদেরও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করতে পারলাম না। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এতবড় একটা জাতীয় উত্থান হল, কিন্তু তার ধাক্কায়

আমরা সামাজিক বিপ্লবের কাজটিকে পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারলাম না।”[৫৮ক] দ্বান্দ্বিক বিচার ধারার ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ শরৎচন্দ্রের পক্ষে সেদিন করা সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ছিলেন না, ছিলেন মানবতাবাদের অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদেরই প্রবক্তা। একথাও সত্য যে, সেদিন যাঁরা সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট বলে নিজেদের দাবী করতেন, তাঁরাও যথার্থ দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে জীবন ও সংগ্রাম পরিচালিত না করতে পারার জন্য এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধি করতে পারেন নি। স্বভাবতই শরৎচন্দ্রের পক্ষে একথা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি যে, কেন মুসলমান সমাজ ব্যাপকভাবে এই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। আবার মানবতাবাদী হিসাবে সেই মুসলমান সমাজ এবং বিশেষ করে বঞ্চিত, নিপীড়িত চাষী মজুরের প্রতিও তাঁর মর্মবেদনা বিদ্যমান। এই জটিল দ্বন্দ্বের প্রকৃতিকে এবং তার স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করতে শরৎচন্দ্র পারেননি এইটুকুই এবং এই প্রশ্নেই তাঁর সীমাবদ্ধতা ছিল। তাই সাম্প্রদায়িকতার জেরে বাংলা যখন কম্পিত এবং ভেদবুদ্ধির দ্বারা সুকৌশলে তাকে যখন বাড়িয়ে তোলা হয়েছে বা লোকদেখানো ঐক্যের চেষ্টা করা হয়েছে- তখন শরৎচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়েছেন, বিরক্তি জনিত কিছু মন্তব্য করেছেন। যদিও, নিঃসন্দেহে সেই উক্তি এবং মন্তব্য যথাযথ নয়।

এর সাথে আর একটি প্রশ্নও ছিল- যা আমাদের বিচারের মধ্যে নিতে হবে। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, ব্রিটিশ যখন এদেশে এসেছে তখন মুসলমান নবাবদের রাজত্ব ছিল। তাদের সাথেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ হয়েছিল। ফলে মুসলমান নবাবের পতনের মধ্য দিয়ে এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার এরই পাশাপাশি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের হাতেই তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। এই দুটি ঘটনা পরম্পরায় মুসলমান সমাজ প্রবলভাবে ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে পড়ে ছিল। সেই কারণে যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে এদেশের নবজাগরণের উন্মেষ, মুসলমান সমাজ তার থেকে মূলতঃ নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল এবং পুরানো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে পড়ে ছিল। ফলে দেশপ্রেমের পরিমণ্ডলের মধ্যে আসার পথে এটা আর একটা দুর্লঙ্ঘ বাধা হিসাবে কাজ করেছে। নবজাগরণের অন্যতম বলিষ্ঠ প্রবক্তা কাজী নজরুল ইসলাম তাই মুসলমান যুবকদের একসময় বলেছিলেন যে, ‘তোমাদের দরজার সামনে ঐ যে একটি পর্দা রয়েছে তার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রবেশ দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাকে ছিঁড়ে ফেল, - সূর্যের আলো ঘরে ঢুকতে দাও।’ কিন্তু তা খুব বেশী করা সম্ভব হয়নি। ফলে এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা, সেই যুগ এবং মানবতাবাদী দর্শনের বাস্তব সীমাবদ্ধতাগুলিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে আমাদের বিচারধারা সঠিক হবে না। এতদসত্ত্বেও মুসলমান সমাজের উপর শরৎসাহিত্যের প্রভাব নানান জায়গায় আমরা দেখতে পাই। বিশিষ্ট কবি গোলাম কুদ্দুসের একটি লেখায় দেখা যায় ঢাকার জনৈক বেদনার্ত ও পথ অনুসন্ধানী মুসলিম তরুণ কমিউনিস্ট হওয়ার প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলেন রমা-রমেশের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী পড়ে। গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন-

“চাষীর ছেলের নাম রেখেছিল গওসল।

...আমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কি করে কমিউনিস্ট হলে?

শরৎচন্দ্রের বই পড়ে।

বল কি!

হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

কিন্তু তাঁর বইয়ের মধ্যে কমিউনিজম কোথায়?

তা জানি নে। তবে এটা জানি তাঁর বই না পড়লে আমি কমিউনিস্ট হতে পারতাম না।... আমি ওদের ভালবেসে ফেললাম।... রমা ও রমেশের দুঃখ আমার চেয়ে কম নয়।... তারপর আমার মনে হল, আমার চারপাশে এত দুঃখী লোক!... আমি তখন খুঁজে খুঁজে এক লাইব্রেরী বের করলাম। সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের বই এনে পড়তে লাগলাম। যতই পড়ি ততই দেখি দুঃখ এক রকমের নয়, বহু রকমের!”[৫৯] এই থেকেই গওসলের কমিউনিষ্ট হওয়া- ভাবতে বিস্ময় লাগে!

এই আলোচনার পরিসরের মধ্যে না হলেও একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শরৎচন্দ্র বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের উপাসক ছিলেন এবং এটি তদানীন্তন সময়ে সবচেয়ে অগ্রসর চিন্তাধারা ছিল বলেই, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী না হওয়া সত্ত্বেও সমাজ পরিবর্তনের অভিমুখকে অস্পষ্টভাবে হলেও সেদিন চিনতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই

আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আপসকামী ধারার প্রতিনিধি গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলতে পেরেছিলেন, "...তাঁর আসল ভয় সোস্যালিজমকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে?" সেদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি সম্যকভাবে একথা উপলব্ধি করতে পারতেন- তাহলে আমাদের দেশের ইতিহাস হয়ত অন্য মোড় নিতে পারত।

এরই পাশাপাশি মজুরের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনকে দেখে শরৎচন্দ্র আহ্বান জানিয়েছেন, "আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমনধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা।" আর এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিক সর্বহারা শ্রেণীর কাছে সেই ১৯২৬ সালে, যখন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়েই তাঁর বিরক্তিজনিত বিতর্কিত ব্যতিক্রমী মন্তব্য এবং অবশ্যই যা যথাযথ ছিলনা- ঠিক তখনই তিনি 'পথের দাবী'-তে ধর্ম-বর্ণের উর্দ্ধে উঠে শ্রমিক শ্রেণীকে আহ্বান জানিয়েছেন, "এ কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এর দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই.... হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, জৈন শিখ কোন কিছুই নেই আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত, অভুক্ত শ্রমিক।"[৬২] এ আহ্বান যেন মনে হয় যেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের অধিকারী কারুর। এক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বিদ্বেষ কোনভাবেই প্রকাশ পায় না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের যুগের যথার্থ মার্কসবাদী তথা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা গড়ে তুলবে এই শরৎচন্দ্রের চর্চা করবে তাঁর যুগোপযোগী মূল্যায়ন। তাঁর সাহিত্য ও মূল্যবোধের সাধনা থেকে নির্যাস গ্রহণের পথ বেয়েই বর্তমান সমাজের নতুন সাহিত্য-মূল্যবোধের ও সংস্কৃতির যথাযথ প্রকাশ ঘটবে- বর্তমানের অবক্ষয়িত অন্ধকারে জ্বলবে মশাল, আমাদের সমাজ অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে পাবে মশালের আলো। আর তাতে সামান্য ন্যাকড়া পোড়া গন্ধের মত 'ব্যতিক্রমী মন্তব্যে'র পুঁজি নিয়ে শরৎচন্দ্রকে যারা কলুষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা মার্কসবাদের নাম নিলেও সত্যিকারের মার্কসবাদী নন। তারা জনমানস থেকে প্রত্যাখ্যাত হবে। আমাদের অভিমুখ হবে শরৎচরিত্র ও শরৎচিন্তার মধ্যে পার্থিব মানবতাবাদী মূল্যবোধ থেকে নির্যাস গ্রহণের সুকঠিন প্রয়াসের দিকে- এই প্রত্যাশা, এই অঙ্গীকার।

তথ্যসমূহ

১) Thesis of the problems of Marxist criticism - A. Lunacharsky 'On literature and art'

২) দিলীপ কুমার রায় কৃত নিষ্কৃতির ইংরাজী অনুবাদের 'প্রাককথন', মার্চ, ১৯৩৫

৩) কুমুদরঞ্জন মল্লিককে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, উদ্ধৃত, শরৎচন্দ্র - গোপাল চন্দ্র রায়।

৪) অভিনন্দন পত্র, সুধী প্রধান (হিজলী জেলে রাজবন্দীদের দ্বারা শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে সম্বর্ধনা বাতিল হয় ব্রিটিশ পুলিশের গুলি চালনায় তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ও সন্তোষ মিত্রের হত্যা করার ঘটনায়। সেই রাজবন্দীদের সম্বর্ধনা পত্র)

৫) On literature and art A. Lunacharsky

৫ক) শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে- শিবদাস ঘোষ

৫খ) Collected works– Vol. 23

৬) পথের দাবী- শরৎচন্দ্র

৭) পথের দাবী- শরৎচন্দ্র

৭ক) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ, ১৪০৮, শরৎ সংখ্যা

৮) চরিত্রহীন- শরৎচন্দ্র

৯) গৃহদাহ - শরৎচন্দ্র

১০) শরৎচন্দ্র ও মানবতাবাদ - আবদুল হালিম, বাংলা

১১) সত্যাশ্রয়ী - শরৎচন্দ্র

১২) চরিত্রহীন - শরৎচন্দ্র

১৩) চন্দননগরের আলাপসভায়- শরৎচন্দ্র

১৪) ঐ

১৫) চরিত্রহীন - শরৎচন্দ্র

১৫ক) বাতায়ন, শরৎ স্মৃতি সংখ্যা, ২৮ জানুয়ারি, ১৯৩৮

১৬) শেষপ্রশ্ন - শরৎচন্দ্র

১৭) তরুণের বিদ্রোহ- শরৎচন্দ্র

১৮) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ৪র্থ খণ্ড,

- শঙ্করীপ্রসাদ বসু
১৯) সাহিত্যের রীতিনীতি- শরৎচন্দ্র
২০) দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ- শরৎচন্দ্র
২১) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১) - শরৎচন্দ্র
২২) দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ - শরৎচন্দ্র
২৩) দুটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ- শরৎচন্দ্র
২৪) ব্রহ্মা প্রবাসে শরৎচন্দ্র যোগেন্দ্রনাথ সরকার
২৫) শরৎচন্দ্র ও সমাজনীতি কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী, বাতায়ন, শরৎ স্মৃতি সংখ্যা
২৬) সত্যাশ্রয়ী- শরৎচন্দ্র
২৭) লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি - শরৎচন্দ্র
২৮) মহেন্দ্রনাথ করণকে লেখা চিঠি শরৎচন্দ্র
২৯) সূত্র, শারদীয় নন্দন, ১৩৮২
৩০) সূত্র, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী, ডাঃ ননী গোপাল দেবদাস
৩১) বুলবুল, আষাঢ়, ১৩৪৩
৩২) দিন কয়েকের ভ্রমণ কাহিনী- শরৎচন্দ্র, বিজলী, আশ্বিন, ১৩৩০
৩২ক) শারদীয় নাগরিক, ১৩৪১
৩৩) শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র- গোপাল রায়
৩৪) অবাঞ্ছিত ব্যবধান, বুলবুল, বৈশাখ ১৩৪৩, জাহান আরাকে চিঠি- শরৎচন্দ্র
৩৫) ঐ
৩৬) ঐ
৩৭) মুসলিম সাহিত্য সমাজ - শরৎচন্দ্র
৩৮) ঐ
৩৯) অবাঞ্ছিত ব্যবধান, বুলবুল, আষাঢ়, ১৩৪৩
৪০) ঐ
৪১) মুসলিম সাহিত্য সমাজ - শরৎচন্দ্র
৪২) বুলবুল, ভাদ্র, ১৩৪৩ ৪২)
৪৩) ঐ
৪৪) বুলবুল, জৈষ্ঠ, ১৩৪৩
৪৫) কাদের নওয়াজ, বুলবুল, ভাদ্র, ১৩৪৩
৪৫ক) তথ্যসূত্র, সম্পাদকীয়, চতুষ্কোণ, শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৮২
৪৬) উদ্ধৃত, উদ্ভাসিত শরৎচন্দ্র - সুদীপ বসু
৪৭) সংবাদ সাহিত্য, শনিবারের চিঠি, আষাঢ়, ১৩৪৪
৪৮) শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা - অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, উদ্ধৃত, উদ্ভাসিত শরৎচন্দ্র - সুদীপ বসু
৪৯) প্রবাসী - কার্তিক, ১৩৪৫
৫০) ঐ
৫১) শরৎচন্দ্রের টুকরো কথা - অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল
৫২) শরৎ স্মৃতি, প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৪৫
৫৩) মঞ্জরী, শারদ সংখ্যা, ১৪০৯
৫৪) প্রবাসী - আশ্বিন, ১৩৩৮
৫৫) প্রবাসী - কার্তিক, ১৩৪৫
৫৬) বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ- শরৎচন্দ্র
৫৭) ঐ
৫৮) বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা - শরৎচন্দ্র
৫৮ক) নজরুল জয়ন্তীতে ভাষণ, ‘ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য’ - শিবদাস ঘোষ
৫৯) পরিচয়, মাঘ, ১৩৭০, গোলাম কুদ্দুস- সম্বোধন
৬০) বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ - শরৎচন্দ্র
৬১) শ্রীকান্ত - শরৎচন্দ্র
৬২) পথের দাবী - শরৎচন্দ্র